ড. আব্দুল আজিজ মোস্তফা কামিল

তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত



ড. আব্দুল আজিজ মোস্তফা কামিল

তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত

তরজমা: মুসা আল-হাফিজ

মদীনা পাবলিকেশান্স ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা ঃ ৫৫/বি পুরানা পল্টন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০

দুটি কথা

এর আগে অনুবাদ করিনি কোনো গ্রন্থ। জানতাম না আমার ভিতরে কোনো অনুবাদকের বসবাস রয়েছে। হঠাৎ খান সাহেব হুজুরের কল। আপনাকে একটি বই পাঠিয়ে দিচ্ছি আনুবাদ করে দিতে হবে।' আকাশ ভেঙে পড়লো। খান সাহেব হুজুরকে কী বলবো? না করতে পারলাম না। হুজুর বইটি পাঠিয়ে দিলেন।

বইটি এখন আমার হাতে। বিস্ময়কর এক বই। ইহুদী-খৃষ্টান ষড়যন্ত্রের উৎসকেন্দ্র চিহ্নিত হয়েছে এ বইয়ে। বলে দেয়া হয়েছে চলমান বিশ্বরাজনীতির সব সমস্যার গোড়ার কথা। সে কথাটি কি? সেটা হলো ধর্মোন্মাদনা। ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উন্মাদনা কীভাবে একটি নিশ্চিত প্রলয়ের দিকে পৃথিবীকে নিয়ে চলছে, তার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্য-প্রমাণ সহকারে। লেখক দেখিয়েছেন দুনিয়াকে কীভাবে হাকিয়ে নেয়া হচ্ছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে। ইহুদী-খ্রিস্টানরা সেই যুদ্ধ ঘটাতে চায় তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনে। যদি না ঘটে যুদ্ধটি, তাহলে খ্রিস্টানদের মসীহ পৃথিবীতে আসবেন না, আর ইহুদীদের স্বর্গীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। সেই যুদ্ধের আদর্শ সময় তৃতীয় সহস্রাব্দ। সেই যুদ্ধের নির্ধারিত ক্ষেত্র হলো ফিলিস্তিন আল-কুদস।ইহুদী খ্রিস্টানরা এ যুদ্ধে জিতবে বলেই বিশ্বাস করে। তবে জয়ী হবার জন্যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষকে হত্যা করত হবে। সেই প্রস্তুতি তারা নিয়ে রেখেছে, তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে জাযীরাতুল-আরব এমন কি মক্কা-মদীনা দখল করে নেয়ার জন্য। এ গ্রন্থে এই প্রস্তুতির চিত্রগুলো দেখতে পাবেন পাঠক আর ধরতে পারবেন জায়নবাদী নানা প্রকল্পের গোড়ার প্রসঙ্গ। যে প্রসঙ্গকে লুকিয়ে রাখতে ইহুদী খ্রিস্টানরা যারপর নেই সচেষ্ট। সউদী আরবের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির ইসলামী স্টাডিজ কলেজের লেকচারার ড. আব্দুল আজিজ মোস্তফা কামিল তাদের গোপন বিষয়গুলোকে ফাঁস করে দিয়েছেন এ গ্রন্থে। একটি পারমাণবিক হামলাও তাদের ততটা ক্ষতি করতে পারতো না, যতটা ক্ষতি করেছে এ গ্রন্থটি, সঙ্গত কারণেই অনুবাদ করতে পেরে আমি খোদার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞ। অনুবাদে অসঙ্গতিটুকু আমার আর ভালো দিকগুলো মাওলানা মুহীউদ্দীন খান সাহেবের দোয়ার বরকত। আল্লাহপাক অনুবাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন।

বিনয়াবনত

মুসা আল-হাফিজ

সূচি

ভূমিকা: সালমান মনসুরপুরী ৬
সহস্রাব্দের কিয়ামত একটি পর্যলোচনা সালমান আল-হুসাইনী নদভী ১৩

প্রতি দশকেই যুদ্ধ, প্রত্যেক ধাপেই ধ্বংসযজ্ঞ ২১
ইসরাঈলী সাম্রাজ্য: দুটি কর্মধারা ২৫
খুনের প্রস্তুতি বনাম শান্তির মুলো ২৯
ইসরাঈলী সাম্রাজ্য: উগ্রবাদের গণভিত্তি ৩১
গ্রেটার ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক যাত্রা ৩২
গ্রেটার ইসরাঈলের সামরিক কক্ষপথ ৩৩
আরেকটি যুদ্ধের অট্টহাসি ৩৫

বেথেলহেম ২০০০ খ্রিস্টীয় মৌলবাদের নতুন বিস্ফোরণ ৩৭
গোমরাহীর ইতিহাস ৩৮
খ্রিস্টীয় ইতিহাসে বিপ্লব ৩৯
প্রত্যাবর্তন অথবা দখলদারী ৪০
প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ও আমেরিকা ৪১
ভ্যাটিকানের কাহিনী ৪৪
ফিলিস্তিনের খ্রিস্টানরা ৪৪
তৃতীয় সহস্রাব্দ ও মহাযুদ্ধের কালোমেঘ ৪৭
এ্যাংলিকান খ্রিস্টান ও শেষ প্রজন্ম ৫২
এ্যাংলিকান ও হারমাজদো ৫৪

ইহুদীবাদী কালো থাবার মুখে মসজিদে-আকসা ৬০
ইহুদী নিয়ন্ত্রণে আল-কুদস ৬১
ইহুদীরা শহীদ করবে মসজিদে আকসাকে ? ৬২
কীঘটবে মসজিদে আকসা শহীদ হয়ে গেলে ? ৬৩
কীভাবে ভাঙা হবে মসজিদে আকসা ? ৬৪
ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ইসরাঈল সরকার ৬৭
মসজিদে আকসার তলদেশ খনন ৬৮
সুড়ঙ্গ খনন ৬৮
মুসলমান ও ইহুদী বসতীর মধ্যখানে কাঁটাতারের বেড়া ৬৯

তৃতীয় হাইকল, কখন কীভাবে ৭১
যিশুখ্রিস্ট কোথায় অবতরণ করবেন ঃ ৭২
প্রথম পাথর ৭৪
পাথরের পরে কী ৭৬
সামাদানের কহিনী কল্পকথার বাতি জ্বালিয়ে ইহুদীরা পাল্টে ফেলতে চায় দুনিয়ার গতিধারা ৭৮
লাল গাভী ডেকে উঠলে জেগে উঠবে ইহুদীদের স্বর্ণযুগ ৮৩
গল্পের গাভী ডেকে উঠলো ৮৩
এ জবাই করা কেন জরুরি? ৮৪
কোথায় গাভী? ৮৫
গাভী পাওয়া গেছে ? ৮৬
খুঁত ধরা পড়লো ৮৭
গাভী বিষয়ে আমরা ৮৭
খোদার বংশধরদের নাপাকী ও গাভীর রক্ত ৮৮
জন্মের সময়, জবাইয়ের সময় ৯০

জেরুসালেমে ইহুদী ডিনামাইট ৯১
ইহুদীদের কাছে আল-কুদস ৯১
জেরুসালেম রাজধানী, নতুবা ইসরাইল অর্থহীন ৯৩
জেরুসালেম জবর দখল ৯৩
ইহুদী রাষ্ট্র, ইহুদীবাদী নেতা ৯৪

মসীহের জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা ১০১
ইহুদীদের প্রতীক্ষিত সম্রাট ১০২
তালমুদের বক্তব্য ১০৩
যায়োনিজমের প্রতিষ্ঠায় মসীহের আগমন তত্ত্ব ১০৪
সেক্যুলার ইহুদী ও মসীহের আকিদা ১০৫
কেন মাসীহ? কোন মাসীহ? ১০৮
কী আছে এই ভালোবাসার অন্তরালে? ১১০
মসীহ ও এন্টিক্রাইষ্ট ১১১

ভূমিকা

তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত গ্রন্থটি জনাব আব্দুল আজিজ মোস্তফা কামিলের অসাধারণ এক রচনা। জনাব আব্দুল আজিজ জামে আল-আজহারের ইসলামিক স্টাডিজ কলেজ থেকে ডক্টরেট অর্জন করেন। বর্তমানে সৌদি আরবের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির ট্রেনিং কলেজে ইসলামী সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের উর্দূ তর্জমা যিনি করেছেন, তিনি বিশ্ববরেণ্য ইসলামী বুদ্ধিজীবি সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর (রহঃ) বহুবীদ গুণাবলী ও জ্ঞানগত উত্তরাধিকারের ধারক— মাওলানা সাইয়্যিদ সালমান আল হোসাইনী নদভী (দা.বা)। তিনি নদওয়াতুল উলামার উস্তাযুল-হাদীস ইসলামী চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে এক বিশ্বব্যক্তিত্ব। ইসলামী দাওয়াত ও চেতনার বিস্তারে তাঁর জযবা ও চিন্তাধারা অনবদ্য। গোটা মুসলিম বিশ্ব, এমনকি বিশ্বমানবতার জন্যে দরদী একটি হৃদয় যেভাবে তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে, তেমনি মুসলিম জাতিসত্তার প্রতিটি প্রেক্ষাপটও সমস্যার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত ও প্রতিটি প্রয়োজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে চলছেন তিনি। এর পাশাপাশি সমকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমূহের গতিপ্রকৃতির ধারাগুলো তাঁর কাছে যেনো হাতের রেখার মতো পরিস্কার।

এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের সূচনা যেভাবে হয়েছে ওহীর আলোয় আলোকিত নবী হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে ঠিক তেমনি এর সমাপ্তি হবে ওহীর আলোকধারায় স্নাত পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন ও গোটা বিশ্বে খোদার কালাম জারি করে বিশ্বখেলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। আসমানী সকল ধর্ম মৌলিকভাবে এই বিশ্বাসে অংশীদার। ইহুদীরা এ বিশ্বাসেই অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিশ্রুত নবীর প্রতীক্ষা করছে। খৃষ্টানরা প্রতীক্ষা করছে এ বিশ্বাসের। এমনকি বৌদ্ধরা প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে তাদের ত্রাণকর্তার। হিন্দুরাও অপেক্ষা করছে কোনো নতুন অবতারের।

ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাসী সব ধর্মেই বিশ্বজগতের সমাপ্তি আলো আর কালোর চূড়ান্ত ফয়সালাকারী মহাযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা হিসেবে বর্ণিত। সে যুদ্ধে মিথ্যা পরাজিত হবে, জয়ী হবে সত্য। দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এই সময়ে। মানবেতিহাসের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা আকাশের তলে আত্মপ্রকাশ করেনি। এ ফিতনা সম্পর্কে প্রত্যেক নবী-রাসূল উম্মতকে অবগত করেছেন। সবচে বড় দাজ্জাল, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজীর রাজা, সে আসবে ধর্মীয় নেতার রূপ ধরে, নিজেকে সে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবী করবে আর ইসা মসীহ

(আঃ)-কে আখ্যায়িত করবে দাজ্জাল বলে। তার কাছে অপমন্ত্র আর প্রতারণা কৌশলের এমন সব ভেলকি থাকবে, এর সম্মুখীন হয়ে মানুষের চিন্তাশক্তি পেরেশান হয়ে যাবে। আর বিস্ময়কর চালবাজী অল্প সময়েই এই ধর্মের প্রয়োজনে অনুসারীরা জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এই ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বলেই ইসলামের নাম শুনলেই তারা আগুন হয়ে যায়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ যেনো দাজ্জালের সম্মুখবর্তী বাহিনীর অভিযাত্রা।

দাজ্জালের অগ্রবাহিনীর তৎপরতা মানেই মাহদী (আঃ)-এর সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার চেহারা থেকে অন্ধকারকে সরিয়ে দিতে সেই সম্ভাবনার বাস্তব বিকাশের চেতনায় উম্মাহকে সাজিয়ে দিতে কী কী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে এর একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন আল্লামা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহঃ) এর বন্ধু মাওলানা আব্দুল্লাহ আনছারী (রহঃ) (তিনি ছিলেন কসিম নানুতুবী (রহঃ) এর নাতি) তিনি লিখেছেন— ইমাম মাহদীর (আঃ) সাথে সাক্ষাতের পূর্বে এ উম্মতকে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে।

১. ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং শরীয়তের মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অর্জন।

২. জিহাদের প্রস্তুতি এবং তাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্জন। কেননা ইমাম মাহদীর (আঃ) কাছে এতোটা সময় থাকবেনা যে তিনি আমাদের ধর্ম শিখাবেন ও জিহাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। তিনি যেই মাত্র আত্মপ্রকাশ করবেন, সাথে হিযবুশ শয়তানের মোকাবেলা ও দাজ্জালের সাথে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন।

বিশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে মাওলানা আনসারীর এ উক্তিটির বাস্তবতা বুঝে আসছিলো না। কিন্তু এর পরই দুনিয়ার দিগন্তে দিগন্তে ইসলামী দাওয়াতের আলো নিয়ে এক মাওলানা ইলিয়াস ছড়িয়ে পড়লেন লক্ষ লক্ষ ইলিয়াস হয়ে। চেতনার আগুন হয়ে জ্বলে উঠলেন শায়খ হাসানুল বান্না (রহঃ)। গর্জে উঠলো মাওলানা মওদুদীর কলম শতাব্দীর মিনারে মিনারে আযান উঠলো ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের। জবাবে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে উচ্চারিত লক্ষ লক্ষ লাব্বাইক ধ্বনি বাতাসকে মুখর করে তুললো, এবং পাল্টে দিলো তার গতি। জ্বলে উঠলো ফিলিস্তিন, বিস্ফোরিত হলো চেচনিয়া রুখে দাড়ালো আফগান শুরু হলো যুদ্ধপ্রস্তুতি জিহাদের প্রশিক্ষণ।

কুদরতে ইলাহীর অদৃশ্য হাতের টানে মুসলিম মিল্লাত চোখ ফিরালো কোরআন হাদীসের দিকে। আওয়াজ উঠতে লাগলো 'মুসলিম মোরা ঈমানের টানে এক জাতি এক দেহ।' শ্লোগান উঠলো, না ইসলাম কোনো পরাজিত শক্তি

নয়। তাকে বিজয়ী করতে হবে পৃথিবীতে। জাহেলি প্রথা ও বাতিল মতবাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অবগাহন করতে হবে কোরআন-সুন্নার পরিধিতে। বাড়তে লাগলো দ্বীনি শিক্ষার চাহিদা। এর চর্চা ও ক্রমাগত পেতে থাকলো ব্যাপকতা। এ ছিলো এক উন্মুক্ত পরিবর্তন, প্রত্যেক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যা অবলোকন করে চলছিলেন।

এখানে এক ব্রিটিশ চিন্তাবিদের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য। যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যুদয়কালে বলেছিলেন— 'নতুন করে মোঘল সাম্রাজ্য জীবন্ত হয়ে উঠছে।' এই উক্তি তিনি যখন করেন, কম্যুনিজমের তখন যৌবনকাল। কেউ ভাবতেই পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্ষ বিদীর্ণ করে ছয়টি মুসলিম রাষ্ট্র একদিন আত্মপ্রকাশ করবে। সেই ব্রিটিশ চিন্তাবিদ আরো বলেছিলেন— ঈশ্বর এই ভারতে দুনিয়ার সব মানুষকে করে ফেলবে নিজের অধিন। কেবল তারাই নিরাপদ থাকবেন, যারা ঈমানকে অগ্রাধিকার দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন কিংবা হারামাইন শরীফাইন ও আল-কুদসের নিরাপত্তায় অবস্থান করবেন।

ঈসা মসীহ (আঃ) ও দাজ্জালের প্রসঙ্গটি মুসলমানদের জানা ব্যাপার। বিশেষ করে তারা তো একে খুবই জানেন, যারা ইলমে দ্বীনের চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট, হাদীস পাঠের সাথে সম্পর্কিত কিংবা ওয়াজের মজলিসে যাতায়াত করেন। মুসলমানরা সর্বদাই এ বিষয়টার চর্চা করে চলছেন। কিন্তু সম্প্রতি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যে বড়ো আবেগ ও তীব্রতর বেগ সহকারে এর চর্চা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিডিয়ার মতো এর বিবরণে মুখর হয়ে উঠছে, টেলিভিশনের পর্দা কেঁপে উঠছে এর উত্তাপে। বক্তার মুখে ফেনা উঠছে এর আলোচনায়। গোটা পাশ্চাত্যে এক উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ বইছে একে নিয়ে। বিশেষত আমেরিকা ও ইসরাঈলে স্ব স্ব মসীহের অধিনে বিশ্বের অন্যান্য জাতির মোকাবেলায় বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। ইহুদী-খ্রিস্টানরা নিজেদের অভিহিত করছে মসীহের অনুসারী এবং অপরাপর জাতিকে দাজ্জালী শক্তি বলে প্রতিপন্ন করছে। তারা বিষয়টিকে গ্রহণ করছে জাতিগত জাগৃতি ও গোটা বিশ্বে স্ব স্ব একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার বাহন হিসেবে।

অথচ বিষয়টি এমন নয়। এ হচ্ছে সেই মহাসংগ্রামের শেষ পরিণতি, যা চলে আসছে পৃথিবীর আদি থেকে। এর এক পক্ষে হিযবুল্লাহ তথা আল্লাহর বাহিনী, অপরপক্ষে হিযবুশ শয়তান তথা ইবলিশী অপশক্তি। খোদায়ী বাহিনীতে আছেন নবী-রাসূল (আলাইহিমুসসালাম) ও তাঁদের অনুসারীবর্গ আর শয়তানী বাহিনীতে নবী-রাসূলদের (আলাইহিমুসসালাম) বিরুদ্ধচারী ও তাঁদের হেদায়াতকে

প্রত্যাখানকারী অপশক্তি। এই উভয় বাহিনীর সংঘর্ষে ইতিহাস রক্তাক্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত হিযবুল্লাহর ভূমিকা পালন করবে পৃথিবীতে। অপরদিকে ইসরাঈলীদের ধারাবাহিক দৌরাত্ম্য, অবাধ্যতা ও জেনে বুঝে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে সমস্ত আসমানী কিতাব এই সত্যকে ব্যক্ত করে যে কিয়ামত পর্যন্ত হিযবুশ শয়তানের নেতৃত্ব থাকবে ইহুদীদের হাতে। তারাই শেষ পর্যায়ে মিলিত হবে দাজ্জালের সাথে। তারই সঙ্গী ও অধীনস্ত হয়ে পৃথিবীকে ইসলামমুক্ত করে তুলবে।

আজকের পৃথিবীতে হিযবুশ শয়তানের আস্ফালন এতোটাই মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠেছে যে, তারা সদর্পে দাজ্জালের আগমন সিঙায় ফুঁ দিচ্ছে। এদের আধিপত্য বেড়ে চলছে একে একে। চারদিকে সর্বনাশের বাজনা বাজিয়ে তারা অগ্রগতির পথ করে নিচ্ছে। এ বাহিনীর এক অংশ বর্ণবাদী জায়নবাদ, অপর অংশ ইন্ডিয়ার হিন্দুবাদ। আরেকটি অংশ হলো খ্রিস্টীয় মৌলবাদ। যারা সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়ে আমেরিকা-ইউরোপের নেতৃত্বে বিশ্বজোড়া বহুবিদ দুষ্কৃতি চালিয়ে যাচ্ছে। এই শক্তিগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অভিন্ন ঐক্য ও স্বার্থের বন্ধন। এরাই নানা উপায় আসমানী হেদায়েতের আনুগত্য থেকে মানব জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে লালসার দাস বানিয়ে চলছে। এক আল্লাহর সত্য থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে কামনা-বাসনার উপাসনায় নিয়োজিত করছে। পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণই হিযবুশ শয়তানের ধর্ম।

পানিপথের চতুর্থ যুদ্ধের জন্য দুটি সম্প্রদায়কে তৈরি করে রেখেছেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো পানিপথে যুদ্ধ হবে আবারো? তিনি বলেছিলেন না, উপমহাদেশে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে (হিন্দু-মুসলমান) চূড়ান্ত মীমাংসাকারী এক লড়াই হবে। সেটা পানিপথে নয়, সেটা হবে চিন্তার কক্ষপথে। সেই যুদ্ধে অবশ্য সমরাস্ত্রেরও প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটবে। এ যুদ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ইংরেজ পন্ডিতের সেই উক্তি কি ধীরে ধীরে সত্য হয়ে ময়দানে ধরা দিচ্ছেনা! উপমহাদেশের আকাশে বাতাসে কি কুন্ডলি পাকাচ্ছে না ঈমান ও কুফুরের সর্বগ্রাসী এক সংঘাত?

যেভাবে সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু আপন ক্রমোন্নতির দিকে প্রতিনিয়ত ধাবমান, তেমনি মানুষের চিন্তা-চেতনা ক্রমোন্নতির স্তর সমূহ পাড়ি দিয়ে দিয়ে এমন এক পর্যায়ে আরোহণ করে, সেখানে সে খোদায়ী পয়গামের সর্বশেষ সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। এবং সত্যকে কবুল করার ক্ষেত্রে প্রতিটি অন্তরায় একে একে দূরীভূত হতে থাকে। সেই অন্তরায় সাম্প্রদায়িক হতে পারে,

কিংবা হতে পারে বর্ণভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, অঞ্চল বা রক্ত ভিত্তিক। মানুষের সত্যসন্ধানী আত্মা স্বীয় তৃষ্ণা নিবারণে এইসব বাধার প্রতিটি দেয়ালকে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম। দুনিয়া জুড়ে সভ্যতার সংঘাতের ডঙ্কা বাজছে। চারদিকে ডামাডোল ও শব্দদূষণ সত্ত্বেও সত্যের শীতল জলধারার জন্য মানবমন চাতকের মতো পিপাসার কাতর। এ পরিস্থিতিতে ইসলামের জীবনী সত্য ও স্বভাবগত সৌন্দর্যকে মানবাত্মার দ্বারে দ্বারে সর্বোত্তম প্রক্রিয়ায় পৌঁছাতে না পারা এমন এক পাপ যার ভয়াবহ পরিণতি দুনিয়ার প্রতিটি মানচিত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এদিকে প্রত্যক্ষ সামরিক ক্ষেত্রে কুফুরিশক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখের পর আমেরিকা ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়ে মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এমন এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যার নাম তাদের ভাষায় অপারেশন ইনফিনিটি জাস্টিজ– নগরের অন্তহীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে নগর তাদের প্রতিপক্ষ হলেও অন্তহীন কথাটা ঠিক আছে। কেননা সে যুদ্ধ তারা শুরু করেছে এর শেষ তারা দেখে যেতে পারবে না। ক্রুসেডটাকে তারা কেবল দাজ্জাল পর্যন্ত গড়াবার পথ করে দেবে। তারা তাদের সূচিত ক্রুসেডকে আমাদের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা এখন তার মুখোমুখি।

এই ক্রুসেডের প্রকৃতি এতই ভয়াবহ যে এক চিন্তাবিদের ভাষায়— "এর ফলে হয়তো পৃথিবীতে ইসলাম থাকবে, নতুবা আমেরিকা।' ইসলাম যেহেতু খোদার আখেরী পয়গাম, অতএব দুনিয়া যতদিন আছে, ইসলাম থাকবে। অপরদিকে কুফুরি শক্তির বিনাশ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অভাবনীয় পর্যায়ে ঠেকে কিন্তু কুদরতে ইলাহীর সামনে প্রতিটি সুপার পাওয়ার তৃণখণ্ডের চেয়েও দুর্বল। তবে এটাও সম্ভব যে, আমেরিকার সত্যসন্ধানী হৃদয়গুলো ইসলামকে আপন করে নেবে এবং সে বেঁচে যাবে খোদায়ী পাকড়াও থেকে।

এমতাবস্থায় মানবতার মহান সেবক ঐ ব্যক্তিই হবেন, যিনি দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দেবেন হিযবুশ-শয়তানের নেতৃত্বদানকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের পরিচয়, অতীত ইতিহাসে তারা কি কি দুষ্কৃতির কালিমা লেপন করেছে এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীকে তারা কোন বিপজ্জনক ধ্বংসখাদের কিনারায় উপনীত করতে চায়, কোন বিপর্যয়ের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করতে চায় মানবতাকে।

তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত এমন এক গ্রন্থ যার দর্পণে হিযবুশ-শয়তানের চেহারা আমরা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে পারি। তাদের মানবতা বিরোধী প্রকল্পসমূহ, বিশেষত মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের চিত্র রয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থে ইহুদী ষড়যন্ত্রের উদঘাটক, খ্রিষ্টীয় বিভ্রান্তির নির্ণায়ক এবং

উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় দেউলিয়াত্বের বিকৃত অবয়বের উন্মোচক। এ যেনো ঠিক কোনো গ্রন্থ নয়, ইহুদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দুনিয়া কাঁপানো এক বিস্ফোরণ। এ গ্রন্থের পাঠক ঈসা মসীহ (আঃ) ঈমাম মাহদী (আঃ) ও দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসমূহের সত্যায়ন যখন দেখবেন ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে, তখন তার ঈমান বলিষ্ঠ হবে দৃঢ়তর হয়ে উঠবে।

আশা করি গ্রন্থটি সত্যের প্রতিটি সৈনিক ও মানবতার প্রত্যেক খাদেমের জন্যে মাইলফলক প্রমাণিত হবে। শুকরিয়া জনাব আবদুল আজিজ মোস্তফা কামিলের, শুকরিয়া সায়্যিদ সালমান আল হুসাইনী সাহেবের। গোটা মুসলিম মিল্লাতের ধন্যবাদ পাবার যোগ্য কাজটিই তারা আঞ্জাম দিয়েছেন। এই দুঃসময়ে তাদের বলিষ্ঠ কলম জ্ঞানের আরোও সুদীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করুক। মুসলিম মিল্লাতের চিন্তা-চেতনায় যে জং ধরেছে, সেখানে শান দিক তাদের কলমের আচড়। গাফলতি ও আত্মভুলা নিদ্রার অরণ্যে তাদের শব্দাবলী মুখর হয়ে উঠুক ভোরের কোলাহলে। এই কিতবাটি যেনো উম্মতের জেগে উঠার ওসীলা হয়ে উঠে। হে আল্লাহ কবুল করো।

সালমান মনসুরপুরী
চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফোরাম
লন্ডন
৩০ জুন, ২০০৩ ঈসায়ী

"সহস্রাব্দের কিয়ামত" একটি পর্যালোচনা

সালমান আল-হুসাইনী নদভী

'তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত' এমনই এক গ্রন্থ, যা মুসলিম বিশ্বের চেতনার গভীরে অবিরত ঝাঁকুনি দিয়েই চলে। আর শত্রুর দিকে তীর্যক দৃষ্টি তুলে বলে ওঠে তোমরা কি করছো, কি করতে চাও, আর কতটুকুই বা করতে পারবে, তা আমাদের জানা আছে। বিপুল তত্ত্ব ও তথ্যের আধার এ গ্রন্থ কিন্তু পাঠকের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে রচিত হয়নি। বর্ণনার চমক ও ভাষার লালিত্য রয়েছে এ গ্রন্থে কিন্তু গ্রন্থটি রচিত হয়নি নিছক একটি আকর্ষণীয় পঠন সামগ্রী সরবরাহের লক্ষ্যে। এর লক্ষ্য মুসলিম মিল্লাতের মাথার উপর যে শকুনিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে, তাদের চিনিয়ে দেয়া। তারা কি চায়, কেন চায়, কিভাবে চায়, তা বানান করে বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের সমবেত আকাঙ্ক্ষা যে প্রলয় অনিবার্য করে তুলছে তার একটি জীবন্ত ছবি এঁকে দেয়া।

পাঠক সাধারণের জন্য গ্রন্থের বিষয়টি নতুন বটে। অধ্যায়গুলো তাদের কাছে মনে হবে নতুনতর। এর একটা ভালো দিক আছে। অভিনব বিষয় অনেক সময় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, চেতনায় ঢেউ তুলে। এ গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা থেকে আরেক পৃষ্ঠায় সেই ঢেউই উপলব্ধি করবেন মনোযোগী পাঠক। এক ঢেউ থেকে আরেক ঢেউয়ের চূড়ায় তিনি সাঁতার কাটবেন। বইটি পড়া শেষ হবে। এর বিভিন্ন তথ্য-তত্ত্ব ঘটনাবলী আলো হয়ে জ্বলে উঠবে। এবং আগামী দিনের আগাম বার্তাগুলো সহজ কাহিনীর মতো আপনাকে বুঝিয়ে দেবে বিদ্যমান দুনিয়ার চালচিত্র। এ গ্রন্থ হয়ে উঠবে আয়না, সেখানে আপনি দেখবেন জায়নবাদীদের নানান তৎপরতা, ষড়যন্ত্রের স্রোত, বিভিন্ন আকিদার অবয়ব, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও দৌড় ঝাঁপের ইতিবৃত্ত।

এমন তরো আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু কোথাও ভাষা ও বিষয়ের প্যাচে পাঠক ক্লান্ত হয়ে পড়েন, কোথাও বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতার কারণে পাঠকের কাছে মূল মর্ম থেকে গেছে অধরা। গোটা বিষয়টি দুয়ে দুয়ে চারের মতো বোধগম্য হয়ে উঠেনি। এই গ্রন্থটি আপনাকে সর্বশেষ হিসাবও বুঝিয়ে দেবে। এ গ্রন্থের লেখক ডক্টর আবদুল আজিজ বিন মোস্তফা কামিল সৌদী আরবের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ কলেজে ইসলামী সংস্কৃতির অধ্যাপক। তিনি আল-আজহারের ইসলামিক স্টাডিজ কলেজ থেকে ডক্টরেট অর্জন করেছেন। এই গ্রন্থটি রচনা করেন ১৯৯৯ সালের জুলাই মোতাবেক ১৪২০ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। গ্রন্থকারের উপলব্ধি হলো ইহুদী খ্রিস্টান এবং

মুসলমানদের মধ্যে নিকট অতীতের প্রতিটি সংঘাতে ধর্মীয় চেতনার প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ১৯৬৭ মোতাবেক ১৩৮৭ হিজরী আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে যায়নবাদী রাষ্ট্রের বিজয় ইহুদী ও খ্রিস্টবিশ্বে ধর্মীয় ভাবাবেগের তীব্র তরঙ্গ বইয়ে দেয়। তেমনিভাবে মুসলমানরাও ধর্মনিরপেক্ষ শ্লোগান ও নাস্তিক্যপনার কুহক থেকে বিপুলভাবে অনাগ্রহী হয়। এবং মুসলিম বিশ্বে ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা বলিষ্ঠ হতে থাকে। ১৯৬৭ এর যুদ্ধ শেষে ইসরাঈল ও আমেরিকায় ইহুদী ও প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের বহু আন্দোলন, সংগঠন ও নানামুখী প্রকল্প দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় সহস্রাব্দ যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলো, ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের জোয়ারে চারদিক তলিয়ে যাচ্ছিলো। ইহুদী ধর্মগ্রন্থে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তি ও তৃতীয় সহস্রাব্দের আগমনের সাথে জড়িয়ে আছে বহু ভবিষ্যদ্বাণী। তারা এই সময়টিকে জাতিগত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক মোড় হিসেবে অভিহিত করে থাকে। তাদের মতে এখনই তাদের সময়। গোটা বিশ্বে ইহুদী একাধিপত্য ও পবিত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় এই সহস্রাব্দ। অপরদিকে খ্রিস্টানদের কাছে এই সময়টি হলো দুনিয়ার নাজাত দানকারী ঈসা মসীহের অবতরণ এবং খ্রিস্টবাদের বিশ্বরাজত্ব প্রতিষ্ঠার সুসময়। আবার মুসলমানদের মধ্যেও ব্যাপক ভিত্তিক দ্বীনী অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জোরালো যুক্তিগুলো উচ্চারিত হচ্ছে সচেতন মহলে। মুসলিমদের ইউরোপ-আমেরিকার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তৃতীয় সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাবার সুবিপুল আয়োজন এ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা এবং বিস্ময়কর সব স্বপ্নের বুননে এক উন্মাতাল রূপ, এক ধূমায়িত উত্তাপ আর এক আত্মহারা জোকের বন্যা বয়ে গিয়েছিলো ইহুদী মহলে। দেখা গিয়েছিলো অভাবিতপূর্ব কর্মকাণ্ড। ইহুদী-খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান নিজের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের কারণে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, মিসর এবং জযিরাতুল আরবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। তাদের সবার মতে দুনিয়ার বড় ঘটনাবলী শেষ জামানায় এই ভূখন্ডেই সংগঠিত হবে। ইরাক হচ্ছে সায়্যিদুনা ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্মস্থান, সিরিয়া ঈসা মসীহ (আঃ)-এর জন্মস্থান এবং মিসর হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রেরিত হবার স্থান। তাঁর দাওয়াত ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো সভ্যতার এই পীঠভূমি। আর জাযিরাতুল আরব শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মস্থান ও সাধনার রাজধানী। এই সব এলাকা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বুনইয়াদী এলাকা। চিরকালই এ অঞ্চল মানুষের আকিদা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে কেন্দ্রের মর্যাদা রাখছে। মক্কার জমিন থেকে মানবিকতার হয় মহীয়ান সূচনা আর সিরিয়ায় রচিত হবে তার সর্বশেষ সমাপ্তি।

ঈমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বক্তব্য হলো— কোরআন-হাদীস ও আম্বিয়ায়ে কেরাম (সাঃ) থেকে যা বর্ণিত, তাতে বুঝা যায় দুনিয়ার সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার সূচনা মক্কাভূমি থেকেই হয়েছে। চাক্ষুষ উপলব্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান থেকে এর পক্ষে সমর্থন মিলে। মক্কা হচ্ছে সৃষ্টি জগতের নাভিস্থল। এখানেই বিশ্বনবীর (সাঃ) নবুওয়ত উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আলোয় পৃথিবী থেকে আঁধার পালিয়েছে, প্রাচ্য-প্রতীচ্য হয়েছে আলোকিত। এর দিকে রুখ করে সালাত আদায় করা হয়, এর দিকে নিবদ্ধ হয়ে হাজ্বীরা আসে হজ্বে এবং ভক্তিবিগলিত চিত্তে একেই তওয়াফ করে। এই কাবা ইহ-পরকালের বহু কল্যাণের ধারক। হেজাযই তো সেই ভূমি, ইসলামের প্রথম মানচিত্র হিসেবে আল্লাহ যাকে নির্বাচিত করেছিলেন। আর সিরিয়া? হ্যাঁ, সিরিয়াতেই হবে শেষ সম্মিলন ময়দানে মাহশর। শরীয়তের দলীলসমূহ এ কথারই জানান দেয়। বায়তুল মোকাদ্দাস ও আশপাশে এরপর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার নতুন সময়-কাল আসবে। শেষ জামানায় ইসলাম সিরিয়ায় নবতর বিকাশ অর্জন করবে। যেভাবে মক্কা বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে উত্তম, তেমনি মুসলিম মিল্লাতের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিবর্গ পরবর্তীদের থেকে উত্তম (দেখুন, মজ মুয়া, ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৭ খণ্ড, ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

এই এলাকাকে ঘিরে দুনিয়া জুড়ে ফিতনার যে বিষবাষ্প ঘনীভূত হচ্ছে, এ নিয়েই প্রধানতঃ এ গ্রন্থে আলোচনা হবে। কিন্তু ফিতনা ও বিপর্যয় যদি হয় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, তাহলে এর উপর কিছু প্রশ্ন উত্তোলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। গ্রন্থকারও এর প্রতি সচেতন রয়েছেন। গ্রন্থকার জানেন, অনেকেই বলবে– ইহুদী-খ্রিস্টানদের সর্বপ্লাবী কর্মকাণ্ডের বিবরণধর্মী রচনা মুসলিম জনমনে ভীতি তৈরি করবে। ফলে তাদের মধ্যে হতাশার জন্ম হবে এবং চেতনার মধ্যে এক ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। লেখক এর জবাব দেন—

১. মৌলিকভাবে ঈমানদাররা এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে সমস্ত পরিবর্তন মূলত আল্লাহর কুদরতী হাতের কাজ। সত্যের শত্রু যতই ফণা তুলুক, আল্লাহ তখন চাইবেন, তার শক্তি হরণ করে ফেলবেন। তাকে করে ফেলবেন মৃততুল্য। আল্লাহর ঘোষণা

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

তারা করেছে তাদের ষড়যন্ত্র। আল্লাহর কাছে আছে ষড়যন্ত্রের প্রতিবিধান। যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এমন হয় যে, এতে পাহাড়ও টলে যায়!

এভাবে অন্যত্র ঘোষণা—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তোমরা কমজোড় হয়োনা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি ঈমানদার হয়ে থাকো। (সূরা আলে-ইমরান ১৩৯)

২. সহস্রাব্দের ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহের বিরুদ্ধে ইহুদী খ্রিস্টানদের ভয়াবহ এক চ্যালেঞ্জ। যার পিছনে আছে মানবতাবিরোধী এক ঐক্য। ঐক্যের ফলে সৃষ্টি হওয়া দানবিক শক্তি চোখ পাকিয়ে মুসলমানদের করতে চায় ভীত-সন্ত্রস্ত। আমরা এ গ্রন্থের মাধ্যমে এই সত্যকে উচ্চারণ করবো যে মানবতা বিরোধী হম্বি-তম্বিতে আমরা ভয় পাবার কেউ নই। আল্লাহর অভয় বাণী

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

ওরা মূলত শয়তান ভয় দেখায় স্বীয় চেলা-চামুন্ডাদের। ঈমানদাররা এদেরকে ভয় পেয়োনা। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো— ভয় করো আমাকেই (আলে ইমরান ১৭৫)।

৩. আল্লাহর সৃষ্টির চিরন্তন স্বাভাবিকতা হলো রাত্রি যখন চূড়ান্তে পৌছে, আল-কাতরার মতো অন্ধকার যখন ঢেকে ফেলে সবকিছু, তখনই এরই আড়াল থেকে আশার আযান ধ্বনিত হতে থাকে। কেননা, অন্ধকারের চূড়ান্তে পৌছা সূর্যোদয়েরই ঘোষণার নামান্তর। জাহেলিয়াত চরম পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে, এর অর্থ তো এটাই যে দ্বীনে হকের সূর্যরাঙা এক সকাল এর পিছে পিছে ছুটে আসছে। তখন দুনিয়া হবে মানবিক। রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ইনসাফের। দুনিয়ার দৃশ্যাবলী যেনো বলে চলছে, শুনো, আসছে সেই সময়, যার সুসংবাদ দিয়েছেন নবীয়ে রহমত– দিন-রাত্রির সীমানার সর্বত্রই এ দ্বীন পৌছে যাবে। কাচা পাকা এমন কোনো ঘর আল্লাহ বাকি রাখবেন না, সব ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করবে। ইজ্জত ওয়ালাদের কাছে ইজ্জত সহকারে অপদস্তদের অপমানিত করে। এটা সেই ইজ্জত যা আল্লাহ ইসলামে রেখেছেন। এটা সেই অপমান, যা কুকুরের সাথে আল্লাহ সংযুক্ত করে রেখেছেন।

৪. ঈমানদার ভীত হবে ? সে হতাশ হবে না, হতে পারে না। কেননা তার একিন আছে যে, পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক দ্বীন যেহেতু আল্লাহর, তাই এর সাহায্য ও এর বিজয় নিশ্চিত করা আল্লাহর কাজ। তিনি বলেছেন—

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي

আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব (সূরা মুজাদালাহ, ২১) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মত যখন দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসবে খোদার নুসরাত তখন অনিবার্য। আল্লাহ বলেন—

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

তোমরা যদি খোদার দ্বীনের নুসরাত– সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের নুসরাত করবেন। তোমাদের কদমগুলোকে সুদৃঢ় করবেন (সূরা মুহাম্মদ–৭)

৫. একথাও মনে রাখা দরকার যে তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম বছর চলে যাবার পর ইহুদী খ্রিস্টানরা দুটি অবস্থার মুখোমুখি। তারা ইতোপূর্বে যা কিছু দাবী করেছিলো এবং যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো হয়তো তা পূরো হবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে পাড়ি দিতে হবে ব্যাপক যুদ্ধের বধ্যভূমি। পেরুতে হবে রক্তের নদী, করতে হবে বিস্তর ধ্বংসসাধন। আর যদি তাদের ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিঘোষিত দাবীনামা ও ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের বিশ্বাসে সংসয়ের ঘুনপোকা বাসা বাঁধবে। তাদের ধর্মকে অবিশ্বাস করার নতুন কারণ তৈরি হবে। ধর্মের প্রতি আনুগত্যের চেতনা নিস্তেজ হতে থাকবে।

উভয় পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উপর বিশাল দায়িত্ব এসে বর্তায়। প্রথমাবস্থায় মুসলমানদের তৈরি থাকতে হবে সর্বব্যাপী এক যুদ্ধের প্রতিরোধ লক্ষ্যে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এগিয়ে আসতে হবে ধর্মহীনতার পঙ্কিতলতা থেকে উদ্ধার করে ইসলামের আলোর দিগন্তে তাদেরকে নিয়ে আসার দায়িত্ব সম্পাদনে।

ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে যে সংঘাত, সেটা তো সর্বাত্মক এক মোকাবিলা। সেখানে শুধু প্রথাগত যুদ্ধ হবে তা নয়। আসল যুদ্ধ হলো বিশ্বাস ও চিন্তাধারায়। যদিও জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ লড়াইটা ছড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু আসল লড়াই হবে চেতনার এলাকায়। এক্ষেত্রে তাদের প্রাণশক্তিহীন অবক্ষয়ক্লিষ্ট জীবনধারার বিপরীতে হৃদয়গ্রাহী, আকর্ষণীয় ও প্রাণসম্পদে বলিষ্ঠ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে উপস্থাপনের দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এক্ষেত্রে মিশনারীরা নিজেদের আকিদার দৈন্যদশা সত্ত্বেও কী বিপুল কর্মধারার জলস্রোত তৈরি করেছে। কী সহজ স্বাভাবিকতায় আধুনিক প্রযুক্তিকে তারা এ কাজে ব্যবহার করছে! অপরদিকে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা এবং ইসলামের স্বভাবগত সত্যের সৌন্দর্য নিয়ে আজ কোথায়? দাওয়াতের ময়দানে ধাবমান ঘোড়ার মোকাবেলায় ভারবাহী গাধার উপর সওয়ার হয়ে কেউ পারে প্রতিযোগিতা করতে ? সে প্রতিযোগিতা হবার নয়, অতএব, তা হচ্ছেও না।

একথা অবশ্যই অগতির দাবী রাখে যে, ধর্মহীন সেক্যুলার ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রধানত বাহ্যিক অবস্থাকেই অবলোকন করেন। কোনো বিষয়ের অন্তর্নিহিত দিকের প্রতি তাদের উৎসাহ নেই। বাহ্যিক দিকের বাইরে তো তারা অন্য কিছুকে পাত্তাই দিতে রাজী নন। তাদের বস্তুবাদী স্বভাব যা দেখছে, তা নিয়েই মেতে উঠে, একেই সত্য হিসেবে জানে, একেই প্রচার করে বেড়ায়। নিজেদের উপযোগিতার পাল্লা দিয়ে প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাপ তারা করে। হয়তো কোনো একটি বিষয়ে বাহ্যিক দিকের দ্বারা আকৃষ্ট হলো কিন্তু এর ধর্মীয় তাৎপর্য সম্পর্কে সে অবগত নয়, অথবা বুঝে শুনেই বিভ্রান্তির ফাঁদে পা দিয়েছে;' আপনি যদি তাকে হাকিকতের মুখোমুখি করতে পারেন, যদি যথাযথভাবে তার অবস্থানের অসঙ্গতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, তাহলে তার পায়ের তলায় ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়ে যাবে। সবার আগেই সে লেজ গুটিয়ে পালাবে। সত্যের সম্মুখীন হবার বিপদ থেকে বাঁচতে সে তখন অন্য কোনো আশ্রয়ের অনুসন্ধান করবে। অন্য কোনো ভ্রান্তি ও মিথ্যার আড়ালে মুখ লুকিয়ে নিজেকে বাঁচাবে। পারলে সেখান থেকে শুরু করবে পাল্টা হামলা। শুরু করবে ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডা। আপনি যদি বস্তুবাদ-ভোগবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশকে উদঘাটন করেন, তখন সে আপনার সত্যের জবাব না দিয়ে আপনাকে মৌলবাদী বলে বসবে। জঙ্গিবাদী বলে বসবে। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মতকে অবগত করার দায়িত্ব বড় হয়ে উঠে। আর সেই দায়িত্ব পালনের অংশ তো এই গ্রন্থ রচনা।

এদিকটাও গুরুত্বপূর্ণ যে নানাবিধ বিপর্য ও ফিতনার ঝড়ের কবলে পড়ে লোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক সাহায্য প্রাপ্তির কামনা ও আশাপ্রদ নানান ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আগ্রহের মাত্রা চড়চড় করে বেড়ে যায়। আবার বহু লোক 'ঈমানদারদের বিজয় হবে' এমন তরো সুসংবাদের উপর হেলান দিয়ে গাফলতি ও তন্দ্রার স্বাদ উপভোগ করতে থাকে। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজেদের সৌভাগ্যকে জয় করার পরিবর্তে তাকদীরের জাবরকাটে। এই পরিস্থিতিতে পোকামাকড়ের মতো বেরিয়ে আসে সুযোগ সন্ধানীরা। তারা নিজেকে মাহদী হিসেবে দাবী করে, সুফইয়ানী হবার আওয়াজ তুলে, এমনকি নিজেকে ঈসা মসীহ (আঃ) বলে দাবী করে হট্টগোলে পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলে। উম্মতের জন্য তা এক ভয়ানক ফিতনা হয়ে উঠে এবং সেই ফিতনা অধিক থেকে অধিক লোককে গোমরাহ করার জন্যে দুনিয়া দাপিয়ে বেড়ায়। হুযূর (সাঃ) এই সব মিথ্যা মসীহ সম্পর্কে উম্মতকে সাবধান করেছেন এবং সর্বোপরি যে বিষয়টির উপলব্ধি আবশ্যক তাহলো আল্লাহ তা'য়ালার কতিপয় বিধান ও ফয়সালা তাকদিরী বটে, কিন্তু অধিকাংশ বিধি-বিধান

শরয়ী। আমরা পাবন্দ হবো শরয়ী আহকামেরই। আমাদেরকে তারই অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর সেখানে তাকদিরী ময়া'মেলা জড়িত, সেখানে কেবল বিশ্বাস পোষণই আমাদের দায়িত্ব।

আল্লাহ আমাদের সামর্থ্যের আলোকে কর্তব্য সম্পাদনের যিম্মা থেকে মুক্ত করে অলৌকিক কোনো কিছুর হুকুম দেননি কখনো। দায়িত্ব আমাদেরকে এই দেয়া হয়েছে, যেনো আমরা প্রতিটি পরিস্থিতিতে শরীয়ত কি বিধান দিয়েছে তা জানি, এবং প্রতিটি প্রেক্ষাপটে শরীয়তের দিক নির্দেশকে অবলম্বন বানাই। এগুলো হচ্ছে সেই সব চিন্তা, উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ, যা আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা ও সূচনা অংশে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

আমার মনে হয় ইহুদী-খ্রিস্টানদের ফিতনার বিস্তারিত বিবরণ কেবলই জ্ঞানভান্ডারে নতুন সংযোজন এবং এর সীমানাকে প্রসারিত করার জন্যই নয়, বরং তা ঈমানকে তরতাজা করবে। এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের পর্যালোচনা পাঠককে হতাশ ও বিষাদক্লিষ্ট করে ফেলবে; এমনটা বলা সম্ভব নয় মোটেও। ফিতনা ও দূর্যোগের বিরবরণের যদি এই দোষ ধরা হয়, তাহলে এ সম্পর্কিত হাদীসের যে বিশাল ভান্ডার রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে কি বলবেন? আমি তো এই গ্রন্থ পড়ে নবিজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসের গহীনে হারিয়ে যাই। আমি যেনো দেখতে পাই বিদ্যমান পরিস্থিতি ও ঘটনাচক্র কিভাবে সত্যায়ন করছে কোরআন হাদীসের বিবরণকে। আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বর্ণনায় ঈসা মসীহ (আঃ) ও দাজ্জাল সম্পর্কিত বিশ্বাসে কী সুগভীর মিল রয়েছে তা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাই।

আমার হৃদয় যেনো তখন আচমকা বলে ওঠে— ان هذ لهوا الحق

'সন্দেহ নেই সত্য এ দ্বীন।'

হৃদয়ে তখন আসে প্রশান্তি বিশ্বাসে আসে বলিষ্ঠতা ভাবগুলো যেনো হতে থাকে দৃশ্যমান, অতীতের চেহারা ভেসে উঠে বর্তমানের আয়নায়, সমস্ত নবীর প্রতি সত্যায়ন হয় সুদৃঢ় এবং তাদের মৌলিক বিষয়গুলোর একত্ব ও সামঞ্জস্য পরিণতিতে দ্বীনে হকের একত্বকেই চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি সঠিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সঠিক কর্মপন্থার দিশা পাওয়া যায়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কক্ষপথ ও যথার্থ পদক্ষেপের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন তথ্যসমূহের দিকচিন্তাহীন ঘূর্ণনের পিছু ধাওয়া করতে হয় না। লক্ষ্যহীন তিরন্দাজী দ্বারা চিন্তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে হয় না। এবং বাহ্যিক অবস্থার একচক্ষু বিবরণের

জটলা থেকে সত্যকে জাহির করার জটিল 'জুহদ' থেকে চমৎকার নিষ্ক্রান্তি মিলে যায়।

সঠিক সূত্র থেকে সঠিক উপলব্ধির ফলাফল এই দাঁড়ালো যে ১৯৯৯ সালে গ্রন্থকার যেসব তত্ত্বের জানান দিলেন, সেগুলো আজ বিস্ফোরিত বাস্তবতা। যে অনুমান ও আশঙকা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, ২০০৩ সালের মধ্যেই বিশ্বপরিস্থিতি তার অধিকাংশেরই সত্যায়ন করলো। মনে হতে লাগলো সামনের দিনগুলো আরও উদঘাটন করবে নতুন পর্দা। লেখকের উপলব্ধিগুলো তত্ত্বের খোলস থেকে বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ছে দুনিয়ার দৃশ্যময়তায়। একটার পর একটা, একটার পর একটা।

আমি বিষয়গুলো অনুবাদে শব্দের তর্জমা করতে চাইনি। বরং সংক্ষেপণের পথ ধরে অনুবাদকের স্বাধীনতার হাওয়া খেয়েছি। তবে বক্তব্যের মর্মকে মূল্য দিয়েছি পুরোটাই। যাতে পাঠক আগাগোড়াই পরিচিত হতে পারেন মূল লেখকের মর্মের সাথে। আমার প্রত্যাশা এই গ্রন্থটি দৃষ্টি উন্মোচন করবে অনেকেরই। কাঁপিয়ে তুলবে বহুজনের ভাবনাকে। আর ছড়িয়ে দেবে প্রাণে প্রাণে ঈমানের রোদ। এ গ্রন্থ আপনাকে বিষয়টি বাস্তবে ঘটার আগেই যেনো সবকিছু বলে দিচ্ছে। ফলে বাস্তবতার মুখোমুখি হলে আপনি মুষড়ে পড়বেন না। হতবিহ্বল হবেন না। জানবেন কি করতে হবে। এ মহান লক্ষ্য নিয়েই হুযূর (সাঃ) অনাগত দিনের খবর উম্মতকে জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস পোক্ত আছে। ধৈর্যকে পরীক্ষায় ফেলে দেয়া নানা ঘটনা রক্তের নহর বইয়ে দেয়া নানা দাস্তান এবং প্রলয়করী ভূমিকম্পের মতো ধেয়ে আসা নানা বিপর্যয়ের পরও 'তৃতীয় সহস্রাব্দের' এ সংঘাতে বিজয় হবে আমাদেরই। শক্তিমদমত্ত শত্রু আমাদের খেয়ে ফেলার জন্য জিহ্বা ব্যাদান করছে, কিন্তু আসলে তারা দেখতে চাইছে নিজেদেরই মৃত্যুর হলাহল। তারা এগুচ্ছে, খুব দ্রুত এগুচ্ছে। কিন্তু সেই এগিয়ে চলা ইতিহাসের ভাগাড়ের দিকে, যেখানে তাদের শেষ সমাধি রচিত হবে।

এলাহী! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। পরীক্ষায় ফেলোনা আমাদের। আমরা চাই দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার তাওফিক। মুসিবত ও পদস্খলন থেকে বাঁচাও আমাদের। রক্ষা করো সমস্ত দাজ্জালী ফিতনা থেকে। আমীন

প্রতি দশকেই যুদ্ধ, প্রত্যেক ধাপেই ধ্বংসযজ্ঞ

যায়নবাদীরা চেষ্টা করে কোনোভাবেই যেনো তাদের বৃহৎ ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের ব্যাপারটি প্রচারিত না হয়। এজন্যে তারা তাদের পরিভাষাগুলোকে ঢেকে রেখেছে রহস্যের আবরণ ও দুর্বোধ্য বক্তব্য দ্বারা। কিন্তু ধর্মীয় উৎস ও রাজনৈতিক প্রকল্প সমূহের গভীরতর অধ্যয়নে এমনিতেই জাহির হয়ে যায় বৃহৎ ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের গোপন ব্যাপারটি। সেই সাম্রাজ্য কায়েমের জন্য কেবল বায়তুল-মোকাদ্দাস ও সিরিয়া ভূখণ্ড দখলই যথেষ্ট নয়, বরং এ থেকে বহুগুণ ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়েই সাম্রাজ্যের কল্পিত মানচিত্র ইহুদীদের মগজে অঙ্কিত রয়েছে।

তাওরাতের বক্তব্য হলো— 'প্রভু আব্রাহামের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, তোমার বংশধরদেরকে মিসরের নদী থেকে ফোরাতের জলধারা পর্যন্ত মধ্যবর্তী ভূখণ্ড দান করবো।

সেক্যুলারিজমের কাছে আত্মসমর্পিত আরবরা এই এলাকার উপর নিজেদের অধিকারের পক্ষে যে দাবি উপস্থাপন করেন, এর ফাঁক ও ফাঁকি সুস্পষ্ট। তারা বলে, ইহুদীরা সর্ব প্রথম জেরুসালেমের অধিবাসী ছিলো। এ কারণে ঐতিহাসিকভাবে তাদের অধিকার কেবল স্বীকৃত হতে পারে জেরুসালেমের উপর। ধর্মনিরপেক্ষতার স্বভাবগত পক্ষাঘাত এ যুক্তির ভিতরেও চোখ মেলে আছে। ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে উৎসারিত কোনো তত্ত্বেই যেমন অন্তর্দৃষ্টি বলতে কিছু নেই, এ তত্ত্বটিও তেমনি। এ তত্ত্ব মানা হলে ইসরাঈল আগামীকালই নিজেদের আবাসভূমি হিসেবে মিসরকে চাইবে দখল করে নিতে। অপরদিকে কিবতি খ্রিস্টানরা বলবে মিসরে আমরা আগ থেকে ছিলাম। মিসর আমাদের।

ইহুদীদের দাবীটা মজার। তারা যেহেতু আল্লাহর নির্বাচিত সম্প্রদায় আর জেরুসালেম হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুত ভূমি, অতএব এ ভূমি তাদের। একে তারা নির্বাচিত ভূমি বলেই অভিহিত করে। যে ভূমির কথা উল্লিখিত আছে তাদের ধর্মগ্রন্থে। ইহুদী আকিদা হলো জেরুসালেম প্রভুর বিশেষ দান। আর অন্যসব এলাকার কর্তৃত্ব ইহুদীদের হবে, এটাই প্রভুর অভিপ্রায়। আসহাহে যাকারিয়া (৩/১০–১২) এ লিখা আছে– ইহুদীরা! খুশি হও, গানে মেতে ওঠো, কেননা আমি আসবো এবং তোমাদেরই সাথে থাকবো। মহাপ্রভু ইহুদীদের দিয়েছেন পবিত্রভূমির উত্তরাধিকার। আর নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন জেরুসালেমকে।' জেরুসালেম যেহেতু প্রভুর এলাকা অতএব ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের এটাই হবে রাজধানী। এটাই প্রধান তীর্থস্থান। এ জায়গার কোনো অমর্যাদা মানেই প্রভুর ঘরের অমর্যাদা।

মুসলিম বিশ্বের পীঠস্থানে ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে আকিদা রয়েছে সেটা আরোও চমকপ্রদ। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার। জানা দরকার ফিলিস্তিন, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হেযাজ সম্পর্কে কি পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগুচ্ছে? ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে ইসরাঈলী মহাসাম্রাজ্যের যে প্রকল্প যায়নবাদীদের মাথায় জেঁকে বসেছে, সেই প্রকল্পটা আসলে কি? এটা আমরা আজ বুঝতে চাচ্ছি। অথচ ইহুদীরা খ্রিস্টবাদীদের সহযোগিতা নিয়ে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাফল্যের সাথে শুরু করে দিয়েছে পঞ্চাশ বছর আগেই।

মনে রাখা দরকার, ইসরাঈল কথাটা যখন রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়, তখন এর বিশেষ একটা অর্থ দাঁড়ায়। যখন ভূমির সাথে মিলিত হয়, তখন বুঝায় অন্য এক মতলব। ইসরাঈল রাষ্ট্র দ্বারা ঐ বিশেষ সীমানা ও মানচিত্র উদ্দেশ্য, যা আজ তাদের অধিনস্ত। কিন্তু ইসরাঈলী ভূমি কথাটার অর্থ লুকিয়ে আছে তাদের জাতিগত অভিপ্রায় ও তাওরাতের বক্তব্যের ভিতরে। সেই অভিপ্রায় ও বক্তব্যের সারকথা হলো নীলনদ থেকে ফোরাতের জলস্রোত পর্যন্ত মধ্যবর্তী গোটা এলাকা ইসরাঈলীদের। ইহুদীদের দখলে থাকলে তো আছেই না থাকলেও তা ইসরাঈলীদের। অন্য কেউ একে ভোগ করলে সে দখলদার, তার বসবাস এখানে অবৈধ।

১৯৮২ সালে সিনাই উপত্যকা থেকে ইহুদীরা যখন সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হলো, তখন তারা শর্ত দিয়েছিলো মিসর যেনো যায়নবাদ প্রতিরোধের যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। এবং সিনাই যেনো প্রতিরোধ মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়। ইসরাঈলের শর্তনামায় অবশ্য লিখা ছিলো অস্ত্রমুক্ত কথাটা। মিসর সম্মত হলো অস্ত্রমুক্ত করার নামে সিনাইকে প্রতিরোধমুক্ত করতে। আর ইহুদীরা ততক্ষণে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ষোলকলা পূর্ণ করে অধিবাসীদের প্রাণশক্তিকে খুন করে ফেলেছে। যাবার বেলায় তারা মিসরকে বলে গেলো সিনাইয়ের সব তেল-গ্যাস কিন্তু আমাদের দিতে হবে।

ইহুদীদের কাছে এই ভূমির গুরুত্ব ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কিত। এই ভূমি ছাড়া তাদের ধর্মপালন পূর্ণ হয় না। তালমুদের ভাষ্য হলো— 'প্রত্যেক ইহুদীকে অবশ্যই বসবাস করতে হবে ইসরাঈল ভূমিতে। এটা কর্তব্য, সকল কর্তব্যের আগে।' শুধু কি তাই? 'ইসরাঈল ভূমি মানেই পবিত্র। ইহুদীদের উত্তম লোকগুলোকে এই ভূমিতেই দাফন করা চাই। এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তার কাফনের সাথে পবিত্র ভূমির কিছু মাটি রেখে দিতে হবে।' তালমুদের ঘোষণা হলো— 'যে ইহুদী পবিত্রভূমির চারগজ জমি অতিক্রম করবে, পরকলে সে

সফল হয়ে গেলো। দেখুন- তালমুদ, ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয়, ৬৬-৭২-৮৪ পৃষ্ঠা) তালমুদের বিধান অনুযায়ী পরকালীন বিষয়গুলো সংগঠিত হবে প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমিতে। সেখানে অবস্থান পরকালীন কল্যাণের এক মহান নিশ্চয়তা। আশরিয়ায় ভ্রমণ অধ্যায়ে ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা লিখা আছে—'ইহুদীদের যে সম্প্রদায় এই ভূমিতে থাকবে তারা মুক্ত নাজাতপ্রাপ্ত।' ইহুদী রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'যে ইহুদী পবিত্র ভূমিতে আছে, সেই সঠিক ইহুদী। এর বাইরে যারা আছে, তাদের কোনো প্রভু নেই। তারা বিচ্ছিন্ন ঈশ্বর থেকে।'

ইহুদীদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এবং এগুলোর ব্যাখ্যায় লিখিত গ্রন্থভাণ্ডারে পবিত্র ভূমি সম্পর্কে রয়েছে অধ্যায়ের পর অধ্যায়। তাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ সম্পর্কিত আকিদাসমূহ খোলাসা করা হয়েছে। ডক্টর পোর্স্টের বয়ান শুনুন— 'মুসার কিতাবে আব্রাহামের সাথে যে ভূখন্ডের ব্যাপারে স্রষ্টার প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণিত, সে ভূখণ্ড হলো তুর পাহাড় থেকে নিয়ে হামাত উপত্যকা এবং নীলনদের জলধারা থেকে নিয়ে ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূভাগ। এই ভূখন্ড নিয়ে ছিলো সোলাইমানের (আঃ) সাম্রাজ্য। উত্তর দিকে ছিলো সিরিয়া, পূর্বে ফোরাত উপকূল, দক্ষিণের সীমানায় ছিলো সিনাই উপত্যকা আর পশ্চিমে তা বিস্তৃত ছিলো ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। (দেখুন, ডক্টর পোর্স্ট, ডিকশনারি অব হলি বুক) এতো গেলো তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক, একে বাস্তবায়নের জন্য তাদের রাজনৈতিক প্রয়াস এবং জাতিগত তৎপরতাও চলছে বিপুল উদ্যমে।

এক্ষেত্রে যায়নবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে। অস্ট্রেলিয়ার নাম করা ইহুদী সাংবাদিক থিয়োডর হার্জেল এ আন্দোলনের উদগাতা ও রূপকার। থিয়োডর জীবনের সব স্বপ্ন ও সাধনা দিয়ে যায়নবাদের বিষবৃক্ষটাকে পেলেপুষে মহীরোহ বানিয়েছেন। যায়নবাদের জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে এর অনুসারীর মগজে পবিত্রভূমি পূর্ণদখলের 'পবিত্র' আকাঙ্ক্ষা ডানা বিস্তার করেছে।

যায়নবাদীদের প্রধান কাজ হলো প্রতিশ্রুত ভূমিকে নিজেদের করে নেয়ার জন্যে বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন। হার্জেল তার ডায়রিতে লিখেছেন— ফিলিস্তিন বা তার আশপাশে কোথাও হবে আমাদের প্রধান কেন্দ্র। ইহুদী জাতীয়তাবাদের জমিতেই স্বপ্নের সৌধ রচনা করতে হবে। এজন্যে রাজনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনের সব ধরনের উপায় আমাদের হাতে থাকতে হবে— এর চে বেশি খোলামেলা কথা আমি বলি না (দেখুন, দিনলিপি হার্জেল ১৮৭৩) দেখতে দেখতে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের বুকের উপর গড়ে উঠলো যায়নবাদের রাজধানী। তারা সেখানে বসেই ইসরাঈলী ভূমি দখল

করে নেবে। বুঝে নেবে দাউদ ও সুলাইমানের (আঃ) শাসনসীমার পুরো অধিকার। হার্জেল লিখেন— মিসরের নীলনদ ও ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইহুদী সাম্রাজ্য আমাদের চাই। ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেই যায়নবাদী আন্দোলন থামছে না। আমরা তখন ওসমানী সালতানাতের সাথে মিসর যে সম্পর্ক রাখে, অনুরূপ সম্পর্ক রাখবো ইহুদী সরকারের সাথে। কোনো এলাকায় ইহুদীদের সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ হয়ে গেলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দণ্ড ইহুদীদের হাতে আসবেই, আসতে বাধ্য।'

হার্জেল এই কথা লিখেছিলেন এমন সময়, যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসতি নির্মিত হবার কোনো সম্ভাবনাই বিদ্যমান ছিলো না। এটা ছিলো এক অসম্ভব স্বপ্ন। খুব বেশি দিন গেলোনা, অসম্ভব সম্ভব হলো। স্বপ্ন ধরা দিলো বাস্তব হয়ে। সেটা ঘটলো এতোটাই দ্রুততার সাথে যে গোটা বিষয়টাকে মনে হলো এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। আসলে কী সেই শক্তি, যার বলে যায়নবাদীদের অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করতে পারলো? যায়নবাদী আন্দোলনের শুরুতে হার্জেল পঞ্চাশ বছর মেয়াদী এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। যার লক্ষ্য ছিলো ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ঠিক পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলো। ইসরাঈল রাষ্ট্র দাড়িয়ে যাবার সাথে সাথেই বৃহৎ ইসরাঈলী মানচিত্র অধিকারের আকাঙ্ক্ষায় সে এখন ব্যাকুল। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের এক আন্তর্জাতিক কমিটির কাছে সে এর একটি রূপরেখা পেশ করেছে। সেখানে ইহুদী প্রতিনিধি হাখাম ফিশম্যান ইহুদী সাম্রাজ্যের চতূর্সীমা খোলাসা করেছেন। ইহুদীদের জাতিগত আকাঙ্ক্ষাও তাওরাতের অঙ্গীকার সমূহের ভিত্তিতে এই সীমানাভূক্ত এলাকাকে ইহুদীরা নিজেদের বলে বিশ্বাস করে। ফিশম্যান সেই বৈঠকে বলেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার ডেলটা এলাকা থেকে নীলনদের দক্ষিণে এগিয়ে যাবে। পূর্বদিকে আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে সোজা ফোরাত উপকূল পর্যন্ত। এদিকে ফোরাতের সন্নিহিত তুরস্কের সীমান্ত এলাকা এবং সিরিয়ার সীমানা পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত। এই হচ্ছে প্রতিশ্রুত ভূমি, এই হচ্ছে ইহুদীদের পবিত্র সীমানা। এই সীমানার মধ্যেই ইসরাঈলী সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনটা ভাবার কারণ নেই। সেই সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হবে, প্রশস্ত হবে, এটাই ইহুদীরা চায়। এক্ষেত্রে কারো সন্দেহ হলে তিনি লক্ষ্য করতে পারেন ইসরাঈলের দুই নীল রেখা বিশিষ্ট পতাকার প্রতি। যা মূলত নীলনদ ও ফোরাতের দিকে ইঙ্গিত করছে। ঠিক তেমনি ছয় কৌণিক তারকার প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই তারকাগুলো ইহুদীদের জাতিগত প্রতীক। এগুলোর দ্বারা হযরত দাউদ (আঃ) এর সুবিশাল সাম্রাজ্যের কথা তারা স্মরণ করে। হযরত দাউদ

ও সোলাইমান (আঃ) এর শাসনাধীন এলাকাই তাদের সাম্রাজ্যসীমা, এটা বুঝাবার জন্যেই পতাকায় এই তারকাগুলো।

ইসরাঈলী পার্লামেন্টের প্রধান ফটকে থাকা সাইনবোর্ড কিসের সঙ্কেত দেয়? সেখানে তাওরাতের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। এর মানে পরিস্কার। ইসরাঈলের পার্লামেন্ট সদস্যরা যেনো ইসরাঈলী সাম্রাজ্য ফিরে পাবার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হন। এজন্যে পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশের আগেই তাওরাতে বর্ণিত বৃহৎ সীমানা ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে স্রষ্টার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে গ্রামে বসবাসকারী ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রার প্রতি খেয়াল করুন। তাতে অঙ্কিত আছে নীলনদ থেকে নিয়ে ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নকশা। এটা কীসের জানান দেয়? ইহুদীদের আসল রাষ্ট্র এখনো অর্জিত হয়নি। সেই সীমানাটাই তাদের আসল সীমানা।

ইসরাঈলী সাম্রাজ্য ঃ দুটি কর্মধারা

ইহুদী রাষ্ট্রের নিয়ন্তাবর্গ এর উপর একমত যে ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের বাস্তবায়নে হুট করে কিছু করা যাবে না। অনেকগুলো ধাপ তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। এ মৌলিক প্রশ্নে ঐক্য থাকলেও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে তাদের মধ্যে দুইটি ধারা ক্রিয়াশীল। একটি ডানপন্থী ধারা, যার প্রতিনিধিত্বে আছে লিকুদ পার্টি। এদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল। আর দ্বিতীয় ধারাটি বামপন্থী। এর প্রতিনিধিত্বে আছে লেবার পার্টি। এদের মধ্যে লিবারেল ভাবধারার প্রাধান্য। উভয় ধারাই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নিজেদের কর্মসূচীকে নানাভাবে রূপায়িত করছে। এবং যখন হাওয়ার গতি যেদিকে তারা একে পরখ করে এবং এর প্রেক্ষিতে ইসরাঈলের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সর্বোত্তম প্রক্রিয়া অবলম্বনে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সক্ষমতার বিবেচনায় ইহুদীরা কখনো ডানপন্থীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়, কখনো বামপন্থীদের হাতে অর্পণ করে প্রশাসনের বাগডোর।

মৌলিকভাবে উভয়ধারাই একই মুদ্রার এপীঠ-ওপীঠ। ডানপন্থী ধারা নিজেদের যে কর্মকৌশলকে প্রকাশ্যে প্রচার করে, তা মূলত হার্জেলের পরিকল্পনার পূনরাবৃত্তি ও বিশ্লেষণ। এক জার্মান উপদেষ্টা হংকর হার্জেলকে প্রত্যাশিত ভূমি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হার্জেল উত্তর দিয়েছিলেন— আমরা প্রয়োজন অনুপাতে প্রত্যাশা করবো। ইহুদী বসতি বাড়তে থাকবে আর আমাদের ভূমির প্রত্যাশাও বাড়তে থাকবে। (দিনলপি–২ হার্জেল ৭০২) বেনগুরিন ছিলেন ইহুদী রাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি এর আরও সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা করেছেন— আমাদের শেষ সীমানা

বলতে কিছু নেই। আমাদের সৈন্যরা জয় করে করে যে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে, সেটাই আমাদের সীমানা।'

তার মতে ১৯৪৮ সালের ২৪শে মে জায়োনিস্ট আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এর ফলে বিশ্বমানচিত্রে ইহুদীদের নিজস্ব একটা ভৌগলিক আত্মপরিচয় স্বীকৃত হলো। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে বহু চুক্তির বিনিময়ে। কিন্তু ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে আমাদের প্রয়াস সমাপ্ত হচ্ছে না। বরং শুরু হচ্ছে মাত্র। আমাদের দায়িত্ব হলো নীল নদ থেকে ফোরাতের মধ্যবর্তী গোটা অঞ্চলে ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। (বেনগুরিনের জীবনী ৩২৭ পৃ.)

এই নীতির উপর অটল ছিলেন লুই এশকল। ১৯৬৭ সালে ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের জন্য বিপুল ভূমি প্রাপ্তির লক্ষ্যেই তিনি যুদ্ধ বাধান। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে প্রকাশ্যেই তিনি এর ঘোষণা দিয়ে বসেন। এ সময় তার কর্মকাণ্ডে ইহুদীদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শীর্ষ নেতারা জড়িত ছিলেন।

গোল্ডামেয়রকে ইসরাঈলের লৌহমানব বলা হয়। তিনি তো সাফ সাফ বলতেন– মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলকে একক পরাশক্তি করে তুলা আমার লক্ষ্য। এরপর এলেন বেগিন। তিনিও ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের জন্যে আবেগ ও অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। এ সম্পর্কিত তার চিন্তা ও পরিকল্পনাগুলো সাজিয়ে লিখলেন বিপ্লবী এক গ্রন্থ– যার নামের তর্জমা বাংলায় দাঁড়ায়–ইনকিলাব। তিনি তাতে লিখেন– তাওরাতের দৃষ্টিতে বনী ইসরাঈলের নবীগণের এলাকাই ইসরাঈলী ভূমি। পরবর্তীতে একে ফিলিস্তিন নাম দেয়া হয়েছে। জর্ডান নদীর উভয় তীর, দক্ষিণ লেবানন ও সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা চিরকালই ইসরাঈলের অংশ। এই রাষ্ট্রের যে কোন ব্যবচ্ছেদ হবে নীতির লংঘন। ব্যাষ্টি ও সমষ্টিগত ইহুদী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কঠোরতা অর্থহীন ও অন্যায় এবং ইসরাঈলী জনগোষ্ঠী ইসরাঈলী ভূখন্ডের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকবে চিরকাল। (ইনকিলাব, বেগিন, ৩২৫ পৃ.)

লিকুদ পার্টির নেতা শামীরের চিন্তাধারায় ছিলো বেগিনের উত্তরাধিকার। বেগিনের পরে সবচে সুস্পষ্টভাবে তিনি ঘোষণা করেছিলেন– ইসরাঈলী সাম্রাজ্যই আমার প্রত্যয়, আমার বিশ্বাস। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রতিশ্রুত ভূমির পূর্ণদখল অসম্ভব। তিনি এই প্রত্যয় ও পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচারে সফল হয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচনে জয়ী হতে পেরেছিলেন। তার নির্বাচনী বিজয় মূলত ছিলো ইহুদীবাদী স্বপ্নের বিজয়। ১৯৯৬ সালে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন নির্বাচনী ইশতেহারের ফলশ্রুতিতে। যে ইশতেহারে ইসরাঈলের

একটি ধূলিকণার দিকে অন্যের হস্ত সম্প্রসারণকে সহ্য না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এই হচ্ছে লিকুদ পার্টি রাজনীতির যারা উদার ও সহনশীল বলে অনেকেই ভেবে থাকেন। তাদেরই যখন এই উগ্রতা, তখন অন্যান্য চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলোর উগ্রতা পরিমাণ করা যায় ?

উগ্রবাদীরা ইসরাঈল ভূখন্ডের দিকে কারো চোখ তুলে তাকানোকেই হত্যাযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করে। এই বিবেচনা এতো প্রবল যে, আমির নামে এক চরমপন্থী ইসহাক রবিনকে হত্যা করে বললো– তাকে খুন করে উচিত কাজটিই করেছি। কেননা ইসরাঈলী ভূমির সাথে তিনি বেঈমানী করেছেন। (রুসিয়া জারুদী তার 'ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় বর্ণনার ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেন– রবিন হত্যা আসলে ইসরাঈলী মহাসাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জের জবাব) ইহুদী রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, রাজনৈতিক নেতারা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে জাতিগত প্রস্তুতির উপর বরাবরই জোর দিয়েছেন। ইহুদীরা সংখ্যায় যেহেতু অল্প, তাই জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে উষ্ণতর দক্ষতা অর্জন করে সংখ্যাস্বল্পতার অভাব পূরণ করতে হয়েছে। বেনগুরিনের বক্তব্য হলো– "আমাদের নবীগণ তিন হাজার বছর আগে বলে গেছেন, 'সংখ্যায় তোমরা কম হবে। অতএব মেধাগত উৎকর্ষ ও কর্মদক্ষতা দিয়ে লক্ষ্যপূরণ করো।'

মজদুর পার্টি সর্বদাই এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর কাজ করেছে। তাদের সবচে বড় আহ্বায়ক শিমন পেরেজ, দ্বিচারিতায় যার জুড়ি মেলা ভার। এক হাতে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার অঙ্গীকারনামা লিখেছেন, অপর হাতে পারমাণবিক অস্ত্রে ইসরাঈলকে সজ্জিত করেছেন। অন্যদের চেয়ে তিনি নিয়ন্ত্রিত ইহুদী ছিলেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর হওয়ার দিক দিয়ে কারো চেয়ে কম ছিলেন না। একদিকে আরব প্রতিবেশিদের নিকট বন্ধুত্বের বার্তা পাঠিয়েছেন, অপরদিকে হিংস্রতার সাথে তাদের রক্তপান করেছেন। শিমন পেরেজ ইসরাঈলী সাম্রাজ্যেরই প্রচার চালাতেন। তার পরিকল্পিত প্রক্রিয়া সহজ। প্রথমে ইসরাঈলকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করো। তারপর ধীরে ধীরে সীমানা সম্প্রসারিত হবে। তিনি দুটি রূপরেখায় কাজ করেছেন–

১. ইহুদীদের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা।

২. প্রতিবেশি আরব রাষ্ট্রগুলোকে সম্ভাব্য সকল পন্থায় দুর্বল করার কুশেশ।

তিনি যেভাবে পারমানবিক শক্তি অর্জনের হিরো বিবেচিত হন, তেমনি ক্যাম্প ডেভিডের পর আরবদের সাথে শান্তিচুক্তির বিশারদও। অসলো চুক্তিসহ আরবদের

সাথে সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তির আবরণকে আড়াল বানিয়ে ভিতরে ভিতরে লক্ষ্য পুরণের জন্য এর বিভিন্ন ধারাকে সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

১৯৯১ সালে তিনি যখন নিরাপত্তা পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, তখনও যে কোন জায়োনিস্ট নেতার মতো তার গোটা মনোযোগ নিবদ্ধ ছিলো সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে ইহুদীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি।

যেসব ক্ষেত্রে সামরিক ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তিনি এর প্রতিবিধান করলেন পারমানবিক শক্তি অর্জনের মাধ্যমে আর অর্থনৈতিক ক্ষতির আশংকাকে মোকাবেলা করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মারমার কাটকাটের বাজার গরম করে তুললেন। এতে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি থমকে যাবে, ইহুদী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের বাজার রমরমা হবে। যার লাভের বড় অংশ যুক্ত হয়ে ইসরাঈলের প্রবৃদ্ধি লাফ দিয়ে উপরে উঠে যাবে। শিমন পেরেজের দৃষ্টিতে মধ্যপ্রাচ্যে মারদাঙ্গায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার মধ্যে ইসরাঈলের বহুবিদ ফায়দা। এক্ষেত্রে আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়ার জন্যে তেজস্ক্রিয় ইস্যুগুলোর মধ্যে তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাকের যৌথ নদীর পানি-বণ্টন, ফিলিস্তিন ও মিসরে ইহুদীবাদী হামলা, খালিজের তেল সম্পদ ইত্যাদি ইস্যুতে ইহুদী চাতুর্য, গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞা যুক্ত হয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্য মারদাঙ্গার প্লাবন বইয়ে দেয়ার উপক্রম হলো।

মধ্যপ্রাচ্যের বিপন্ন পরিস্থিতিতে ইসরাঈলের লাভ কোথায়? এখানে ইসরাঈলের লাভের দিকটি অত্যন্ত সুগভীর। কেননা মধ্যপ্রাচ্য মূলত প্রতিশ্রুত ভূমিরই নতুন নাম। এ ভূমিতে অবস্থানকারী প্রত্যেকেই ইহুদীদের অঘোষিত শত্রু। এদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতার বিষবৃক্ষ গজাতে থাকলে ইসরাঈলের খুশি হবার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। শত্রুরা পরাজয়ের বিরুদ্ধে শক্তিবাজী করুক, ইসরাঈলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিক, এই ছিলো শিমন পেরেজের চিন্তা। তিনি ইসরাঈল থেকে তাদের দৃষ্টি সরাতে কিছু ভূমি তাদের ফেরত দিয়ে 'মহানুভব' হয়ে উঠলেন, আর ফাক পেয়ে অনেক দূর এগিয়ে চললেন বিন্দু হাত ছাড়া করে সিন্ধু হস্তগত করার লক্ষ্য অর্জনে।

শিমন পেরেজের কথা হলো প্রধান বিষয়টি আমরা অর্জন করতে চাই। নিজেদের ইহুদীসত্তাকে হারিয়ে পবিত্রভূমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে দখলিকৃত ভূমিতে সামান্য পিছু হটে পরিণতিতে যদি এ অঞ্চলের প্রধান শক্তি হয়ে উঠার ফুরসত আমরা পেয়ে যাই, তাতে তো আমাদেরই লাভ। পরিণতিতে আমরা শতগুণ উদ্ধার করবো। সহজেই তা হবে।

শিমন পেরেজ লিকুদ পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচক ছিলেন। ওরা চায় আরবদের জমি দখল করে ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। এ প্রক্রিয়া বড়ই দ্বন্দ্বসংকুল, যুদ্ধমুখর, ও বিপর্যয়কর। এর ফলে ইসরাঈল প্রতিবেশিদের সাথে যুদ্ধের চতুর্মুখী ফাদে জড়িয়ে পড়বে। দেশের অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পড়বে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কও টুটে যাবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছুটে যেতে পারে। শিমন পেরেজ তাই ঝুঁকিপূর্ণ পথ পরিহার করে ফিলিস্তিনীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাইলেন।

ওয়ার্কার্স পার্টি গ্রেটার ইসরাঈলের লক্ষ্যপূরণে পারমানবিক ক্ষমতার উপর ভরসা করতে চায়। এর পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে তারা হাতিয়ার বানাতে বলে। এই হাতিয়ার নিয়েই রবিনের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে শিমন পেরেজ মরক্কোর রাবাত থেকে আম্মান ও মস্কো অবধি শান্তি ও নিরাপত্তার শ্লোগান নিয়ে দুতিয়ালি করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উভয় পার্টিই মূলত লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রশ্নে অভিন্ন। তারা একই লক্ষ্য অর্জনে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত ও প্রতীক্ষায় কাতর। আরবদের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকাকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করবে, এ নিয়ে ভিন্নমত তাদের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করার প্রশ্নে উভয়েই নিরাপোষ। আরেকটি দল আছে ইসরাইলে, তারা খোমেন্দি মাগরুর পার্টি। এরা আরবদের মুখের গোসত উপড়ে নিতে চায়। চামড়া ছিঁড়ে ডুগডুগি বাজাতে চায়। এমতাবস্থায় উভয় ধরনের চিন্তাকে সমন্বিত করে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে এক কনফারেন্সে নিম্নোক্ত নীতি ও কৌশল প্রণীত হয়েছিলো।

খুনের প্রস্তুতি বনাম শান্তির মুলো

গ্রেটার ইসরাঈল প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা জরুরী। ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা লক্ষ্য অর্জনে খুবই সহায়ক এবং এর উপর কার্যক্রম পরিচালনায় ক্ষতির আশঙ্কাও কম। কিন্তু সমস্যা হলো, এই প্রকল্পের দিকে লোকদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের রহস্য উদঘাটিত হবার ভয় আছে। অতএব রহস্য যাতে উদঘাটিত না হয়, এজন্যে এর নাম দেয়া হবে নিরাপত্তা প্রকল্প। এই প্রকল্পের জন্যে জরুরী হলো অব্যাহতভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে প্রচারণা চালানো। সবাই যাতে বুঝে ইসরাঈল যুদ্ধ নয়, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চায়। এতে দুটি লক্ষ্য অর্জিত হবে।

১. শান্তির আকাঙ্ক্ষা আমরা যতই ব্যক্ত করবো, শত্রুদের মধ্যে সমরশক্তি বৃদ্ধির আগ্রহ ততই কমবে। বিশাল সামরিক বাহিনী পোষার ব্যয়বহুল চাপ থেকে

তারা নিষ্কৃতি চাইবে। এর প্রয়োজন অনুভব করবে না। ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সংগ্রহের নেশাও তখন উবে যাবে। এর পাশাপাশি শত্রু দেশের নাগরিকদের মধ্যে যুদ্ধের স্পৃহা প্রতিরোধের চেতনা নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে যে কোন উপায়ে জিহাদের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে রয়েছে বিপুল ফায়দা ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হাসিলের নিশ্চয়তা। এদিকে আমরা মিত্রদের নিয়ে সর্বোচ্চ সামরিক প্রস্তুতিতে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবো। তারপর যখন ময়দানে অবতীর্ণ হবো, শত্রুরা বাঘের কবলে পড়া শিশুর মতোই অসহায় দশায় উপনীত হবে।

এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের কর্তব্য হলো সর্বশক্তি দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রচার চালানো। কেউ যেনো আমাদের আন্তরিকতার উপর প্রশ্ন তুলতে না পারে। সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় শান্তির অভিপ্রায় যুক্তকরণ, সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় ধ্বংসের উপকরণ আয়ত্তীকরণ, এ দ্বন্দ্বসংকুল পথকে অবলম্বন করে আমাদের এগুতে হবে। এই সময়ে জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণে দক্ষ করে তুলতে হবে। সমরমুখী করে তুলতে হবে প্রত্যেক ইহুদীকে। আক্রমণাত্মক মানসিকতার বিস্তার ঘটাতে হবে। রক্ষণাত্মক চিন্তার স্থান থাকতে পারে না কোনো ইহুদীর চেতনায়। তাদেরকে বুঝতে হবে যুদ্ধ করেই আমাদের বেঁচে থাকা, শত্রু নিশ্চিহ্ন হলেই কেবল অর্জিত হবে আমাদের লক্ষ্য।

সেই কৌশলপত্রে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়– ইহুদীরা! হঠাৎ করে আমাদের এই পরিবর্তন ও কর্মকৌশল আপনাদের যেনো বিস্মিত না করে। এই প্রশ্ন মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন, যে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের লেলিহান আগুনের মধ্যেই যাদের সাফল্য, তারা কেন শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলছে? যারা দুদিন আগে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতো, কোন মাজেজায় পাল্টে গেলো তাদের মুখের বুলি? আপনারা আশ্বস্ত হোন, সে মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলাম, সেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই আজ শান্তির আওয়াজ তুলছি। সেই উদ্দেশ্যের কথা আপনারা ভালোই অবগত আছেন।

শান্তির আওয়াজ না তুলে চলছে না। কারণ আমরা চাই শত্রুর হাতে কোনো অস্ত্র যেনো না থাকে। নিরস্ত্র অবস্থায় তাকে আমরা খোরাক বানাতে চাই। কারণ আমাদের সমরসজ্জা এখনো চূড়ান্ত পর্যায়ে শক্তিশালী হয়নি। আমরা সর্বশক্তিতে প্রস্তুতি নিতে থাকবো আর শত্রুকে শান্তি ও নিরাপত্তার গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো। তারপর যখন প্রস্তুতি সমাপ্ত হবে, তখন ঠিকই শুনবেন যুদ্ধের সাইরেন বেজে গেছে। আমাদের সৈন্যরা তখন সহজেই এগুতে পারবে। শত্রুর থাকবে না কোনো প্রস্তুতি। তারা থাকবে দুর্বল। তারা তখন যুদ্ধের আগেই হেরে যাবে। যুদ্ধ

করলেও তা করবে পরাজয়কে বিলম্বিত করার জন্য। বিজয় তখন আমাদেরই হবে। আমরা তাদের রাজ্যগুলো পদানত করবো। সারা দুনিয়া জানবে, ইসরাঈলীরা তাদের পবিত্রভূমি অধিকার করেছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তখন উড়তে থাকবে আমাদের পবিত্র পতাকা।

এই হচ্ছে ইহুদীবাদীদের শান্তি পরিকল্পনা। যার উপর আরব নেতৃবৃন্দ ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাদের প্রতিনিধি দলগুলোকে শান্তির দূত হিসেবে বরণ করে নিচ্ছেন। ইহুদীদের শান্তি পরিকল্পনার ভাওতার ভিতর মনে করছেন মধ্যপ্রাচ্যের সব সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে। আর আরবের সেক্যুলার মহল তো ইহুদীবাদী শান্তিপ্রকল্পের গন্ধ পেয়ে ধেই ধেই করে নাচছে। তারা একে 'ঈশ্বরের' তাবিজ হিসেবে ভাবছে। এবং আত্মপ্রতারণার মহড়া প্রদর্শন করছে লেখালেখি ও বক্তৃতাবাজীর মাধ্যমে। ইহুদীরা শান্তি প্রকল্পের বাঁশি বাজিয়ে আরবদের করে রেখেছে বেঁহুশ। আর মাঝে মধ্যে সুযোগ করে পুরনো যুদ্ধ ধ্বংস ও গণহত্যার সিলসিলাকেও জারি রেখেছে। লেবাননের চতুর্থ ধ্বংসযজ্ঞ, খলীজের ধ্বংসলীলা সিরিয়ার গণহত্যা সহ মারতান্ডব চালিয়েই যাচ্ছে। আর যখনই আরবরা এ নিয়ে আহা উহু করতে চেয়েছে, তখনই তাদের নাকের ডগায় শান্তি চুক্তির মুলো ঝুলিয়েছে।

ইসরাঈলী সাম্রাজ্য ঃ উগ্রবাদের গণভিত্তি

শান্তির নামে এই দুর্বৃত্তপনায় ইসরাঈলের রাজনৈতিক খেলোয়াড়রাই কেবল জড়িত নয়, বরং এর পিছনে সক্রিয় আছে ইহুদী ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয়তাবাদী শক্তি। ইমানুয়েল মুহেমান তার জায়োনিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম' গ্রন্থে লিখেছেন– ইসরাইলে চরমপন্থী আন্দোলনগুলোর বাজার খুবই রমরমা। এইসব আন্দোলন গ্রেটার ইসরাঈলের প্রচারক। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজ্যসীমাকে ফিরে পেতে তারা যুদ্ধের জন্য এক পায়ে খাড়া। তারা ঐসব ইহুদীকে দুনিয়ায় রাখতে চায়না, যারা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে উদার। অতীতে এরাই ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান জ্যোতিষী জোনাথনকে হত্যা করেছিলো। আজ তারা খুন করলো নিজেদের প্রধানমন্ত্রীকে (যায়নিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম, ৯৪৮)

ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের চরমপন্থী প্রচারকদের হাতেই খুন হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রবিন। আর এটা ছিলো ইহুদী ধর্মগুরুদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। তারা তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে রবিনকে হত্যা করা বৈধ বলে ফয়সালা দিয়েছিলেন। কেননা তিনি শান্তি চুক্তির নামে পবিত্র ভূমিকে শত্রুর হাওলা করে দিয়েছিলেন।

রবিনকে হত্যা করার উৎসাহ দাতা ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ের যায়নবাদী নেতৃবৃন্দ। এমনকি জোনাথনও এই অপরাধে জড়িত, যিনি ন্যাশনাল হাখাম ইন্সটিটিউটের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। আসলে রবিনের খুনি কোনো ব্যক্তি নয় বরং এতে শরীক ছিলো উগ্র ইহুদীদের সব কয়টি প্রতিষ্ঠান। তাকে মরতেই হতো। কেননা তাকে হত্যার জন্য ইসরাঈলের প্রতিটি ঘরে যমদূতেরা প্রহর গুণছিলো। এদের মধ্যে সিকারিন নামে খঞ্জরধারী একটি গ্রুপ বড় ভয়াবহ। এদের কথাই হলো, আমরা ইহুদীদের অতীত থেকে চলে আসা সেই ধর্মসেবীদের উত্তরাধিকারী, যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তেন না। তাদের লড়াই ছিলো নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে। সেই ধর্মের কোনো ক্ষতি করতো, তাকে লাশ বানিয়ে দিতেন। সিকারিন গোষ্ঠী ইসরাঈলী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে সকল ফরজের বড় ফরজ মনে করে। যে এই ফরজ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শণ করবে, সেই খঞ্জরের খাদ্য হবে। কিংবাগুলির নিশানা হবে।

গ্রেটার ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক যাত্রা

আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদী শত্রুতা বিগত অর্ধশতকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছে। এ হচ্ছে এমন এক ধারাবাহিকতা, যা বিভিন্ন পর্যায়ে রূপবদল করে চলবে। ইসরাঈল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ইহুদীরা এর শেষ পরিণতি অর্জন করতে চায়। এ যাত্রা পথে প্রতিটি দশকেই তারা একেকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কর্ণেল মুহাম্মদ খাত্তাবের পর্যবেক্ষণ মতে– বেশ কয়েকটি দশক ধরে এক সুবিন্যস্ত ধারাবাহিকতায় ইহুদীদের প্রকল্প সম্মুখবর্তী হয়ে চলছে। ১৮৭৬ সালের প্রথম যায়োনিস্ট কনফারেন্স সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলো। সেই কনফারেন্স ইহুদী রাষ্ট্রগঠনের ঐ রূপরেখা অনুমোদন করলো, যা মূলত হার্জেলের অঙনে কাজ করার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই অসংখ্য ইহুদী সংগঠন মাথা গজালো। ১৯০৭ সালে ইহুদীবাদী প্রকল্পের প্রথম ধাপটি বাস্তব রূপ পেতে শুরু করে। দলে দলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে যেতে লাগলো। সেখানে ইহুদী কলোনি তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক যায়নবাদী গ্রুপগুলো দুই হাতে অর্থ ঢালতে লাগলো। ইহুদী বসতি বেড়ে চললো ধীরে ধীরে। তারপর তারা ফিলিস্তিনকে নিজেদের দেশ বলে দাবি করবে।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর ইহুদী শরণার্থীদের জন্য স্থায়ী রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। ফলে তৎকালীন সুপার পাওয়ার বৃটেনের পক্ষ থেকে ইহুদীদের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার দরজা খুলে গেলো। ১৯২৭ সালে বৃটেনের পক্ষ থেকে ইহুদীদের স্থায়ী রাষ্ট্রের জন্য স্থান নির্ধারিত হলো।

তারপর শুরু হলো ফিলিস্তিনে জমি ক্রয়। বহু জমি ক্রয় করা হলো। খেলার মাঠ তৈরি হলো। তারপর ইহুদী ও ব্রিটিশ বন্ধুত্ব শুরু করে দিলো নতুন রাজনৈতিক জোয়ার। ১৯৩৭ সালে আন্তর্জাতিক যায়োনিস্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি সেনাবাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, যে অস্ত্র হাতে তুলার ক্ষমতা রাখে। ছেলেদের নেয়া হলো, মেয়েদেরও নেয়া হলো। নারী-পুরুষ মিলিয়ে একটি সেনাবাহিনী যারা ফিলিস্তিনে ইহুদীবাদী রাষ্ট্র তৈরির সামরিক প্রস্তুতি আঞ্জাম দেবে। ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনকে আরব ইহুদীদের মধ্য ভাগ বাটোয়ারা করার দাবীর পক্ষে জাতিসংঘ থেকে স্বীকৃতি দেয়া হলো। এ স্বীকৃতিই ইসরাঈল রাষ্ট্র ঘোষণার কারণ হয়ে উঠলো। যার ফলস্বরূপ ১৯৪৮ সালে আরব বনাম ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ হলো। যে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ছিলো আগ থেকেই। এ যুদ্ধে ইহুদীদের কাছে আরবরা হেরে গেলো।

১৯৫৭ সালে ইসরাঈল মিসরে তিন দফা হামলা করে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য খালিজ ঘাটির ব্যবহার শুরু করে দিলো এবং মিসরের উম্মে রাশাশ গ্রাম দখল করে গ্রামের নাম বদলিয়ে নতুন হিব্রু নাম রাখলো– ইলাত। ১৯৬৭ সালে ইহুদী সৈন্যরা ইসরাঈলের স্বীকৃত সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা শুরু করলো। তারা সিনাই উপত্যকা, জর্ডানের পশ্চিমাংশ, গাজা এলাকা ও সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখল করে নিলো। নিজেদের সীমান্তে ভয়াবহ অস্ত্রসজ্জা ও সৈন্যসমাবেশ করলো। এবং রাজনৈতিকভাবে ইচ্ছে মতো যে কোন প্রতিবেশী এলাকাকে নিয়ে দাবার গুটি চালাতে লাগলো। ১৯৭৭ সালে ইহুদীরা মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পন্ন করলো। ফলে আরব প্রতিরোধের মধ্যখানে দেয়াল দাঁড়িয়ে গেলো। এবং যায়নবাদী আগ্রাসনের মোকাবেলায় আরব ঐক্যের সম্ভাবনাও কার্যত মৃত্যুবরণ করলো। এরপর আরব সৈন্যদের পক্ষ থেকে শক্তিশালী কোনো হামলা আর হবে না, ইসরাঈল নিশ্চিত হয়ে গেলো। এমনকি আনোয়ার সাদাত বললেন ইসরাঈল আর যুদ্ধের সম্মুখীন হবে না।

১৯৮৭ সালে ইসরাঈল তার পারমানবিক প্রকল্পে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে। ১৯৫২ সালে সূচিত হয়েছিলো এ প্রকল্প। ইসরাঈলের পারমানবিক শক্তি অর্জনের রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছিলেন ইহুদী টেকনেশিয়ান বানানো। তার কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির পর দুনিয়া জানলো ইসরাঈল রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সুপার পাওয়ার হয়ে গেছে। এখন থেকে সে প্রতিটি প্রতিবেশি রাষ্ট্রের মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাবে।

গ্রেটার ইসরাঈলের সামরিক কক্ষপথ

ইহুদীরা নিজেদের মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে প্রতি দশকে একেকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, ঠিক তেমনি সামরিক ক্ষেত্রেও দশকে

দশকে একেকটি সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করেছে। পঞ্চাশের দশকে ১৯৪৮ এর আরব ইসরাঈল যুদ্ধ হলো। ষাটের দশকে হলো ১৯৫৬ সালের যুদ্ধ। সত্তরের দশকে যুদ্ধ হলো ১৯৬৭ সালে, আশির দশকে ১৯৭৩ সালের ভয়ানক যুদ্ধ এবং নব্বইয়ের দশকে ১৯৮২ সালের ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো। ২০০০ সালের শেষ দশকে ইসরাঈলের সমরকৌশল বিশেষ এক পর্যায়ে উপনীত হয়। বিশেষ করে সাদ্দাম হোসেনের গরম গরম কথাবার্তা ইসরাঈলের জন্যে শাপে বর হয়েছিলো।' ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে অর্ধেক ইসরাঈল পুড়িয়ে দেবো' ইত্যাদি বাতাস কাঁপিয়ে তুলা উক্তিকে ঘিরে ইসরাঈলের নিরাপত্তার প্রশ্নটি আমেরিকার কাছে বড় হয়ে উঠেছিলো। ইহুদী নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া চারদিকে হট্টগোল শুরু করলো যে ইরাক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সে দানবিক সব অস্ত্র বানাচ্ছে, দুনিয়ার চতুর্থ সামরিক শক্তি হয়ে উঠছে, এমনকি পারমানবিক ক্ষমতাও অর্জন করে বসছে! চারদিকের এই প্রোপাগান্ডায় কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো সত্যি সত্যিই ইরাক ও ইসরাঈলের মধ্যে গুরুতর কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, না, কিছু ঘটেনি। ইসরাঈল ইরাক হামলা করেনি। ইরাক ঝাঁপিয়ে পড়েনি ইসরাঈলের উপর। সে বরং কুয়েতে হামলা করে বসলো। আর সাদ্দামের এ পাগলামীর খেসারতে ইরাক চুরমার হলো। মধ্যপ্রাচ্যের এ শক্ত খুটি গুড়িয়ে গেলো।

ইরাকী সমরনীতির এ আত্মহত্যা আসলে আন্তর্জাতিক ইহুদী লবির কূটনৈতিক যোগসাজস ও গোয়েন্দা প্রচেষ্টার সাফল্য। এক্ষেত্রে তাদের শেষ লক্ষ্য ছিলো ইরাকের মানচিত্রকে দ্বি-খণ্ডিত করা। ইরাকের বেকুব প্রকৃতির নেতা তাদের ইচ্ছার পক্ষে কাজ করলেন। ইসরাঈলী তৎপরতার এক রিপোর্ট ছেপেছিলো। সেখানে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্যে আন্তর্জাতিক যায়নবাদের কিছু দিকনির্দেশনা প্রকাশিত হয়। যা সে প্রতিবেশি দেশগুলোর উপর বাস্তবায়ন করবে। ইরাক সম্পর্কে এতে লিখা হয়েছিলো– 'ইরাক তেল সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও অভ্যন্তরীণ সংঘাতে বিপর্যস্ত। সিরিয়াকে পর্যুদস্ত করর চেয়ে ইরাককে পর্যুদস্ত করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সম্প্রতি সে ইসরাঈলের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সিরিয়া ইরাক যুদ্ধ বাধাতে পারলে ইরাককে আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল করা যাবে। অন্যথায় আমাদের দিকে ইরাক থেকে বড় ধরনের যে কোন হামলা ধেয়ে আসতে পারে।

আরবদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার মধ্যেই ইসরাঈলের লাভ। তারা তখন নিজেরাই নিজেদের বিপর্যয় রচনা করবে।'

বিগত শতকের শেষ দশকে উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ হলো। সেখানে বাহ্যত ইসরাঈল অংশ নেয়নি। কিন্তু যুদ্ধটা ছিলো তারই আয়োজন এবং যুদ্ধের সব উপকার সে সহজেই পকেটে পুরে নিয়েছে। ছয় দশকে ছয় যুদ্ধ হলো। এখন আরেকটি দশক। একুশ শতকের প্রথম দশক। এখন কোন যুদ্ধ হবে? ইহুদীদের ঝুলিতে কোন ধ্বংসের আয়োজন।

আরেকটি যুদ্ধের অট্টহাসি

ইহুদীদের ইতিহাস, চরিত্র, তাদের রাজনৈতিক নানা প্রকল্প এবং জাতীয় ও ধর্মীয় নেতাদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বুঝা যায় এই দশকে তারা আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধের আগুন জ্বালাবে। শতাব্দীর প্রথম দশকে ইহুদীরা সহস্রাব্দকে বরণ করবে দুনিয়া কাঁপিয়ে। তারপর তাদের কাজ হবে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকটিকে একটি বিশেষ অর্জনের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা। (সে লক্ষ্যে ইহুদীরা গাজায় গণহত্যা চালিয়েছিলো। সিরিয়ায় হামলা করেছিলো। কানায় মানবতার কবর রচনা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিযবুল্লাহর হাতে মার খেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে। কিন্তু একটি ছোট খাটো পরাজয় তাদের যুদ্ধমাতলামীকে প্রশমিত করতে পারে না।) কেননা তৃতীয় সহস্রাব্দের সে বারুদ তাদের মাথায় জমেছে, যুদ্ধের মাধ্যমে এর বিস্ফোরণ অনিবার্য।

মজার ব্যাপার হলো সহস্রাব্দের উন্মাদনায় খ্রিস্টানরাও তাদের যাত্রাসঙ্গী। উভয়ের এই এ্যালায়েন্সের ফলে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বপরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। এবং ইসরাঈলের পক্ষ থেকে যে কোন ইস্যুতে সহসা যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে পারে।

প্রথম ইস্যু হলো, ইসরাঈলের পানি সংকট। এ সঙ্কট ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ইসরাঈলের আবাদী ভূমি ও বসতি এলাকায় মরুকরণ সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। পানি সমস্যায় থমকে যাচ্ছে ইহুদীদের জীবনযাত্রা। বিশেষজ্ঞদের নানা রিপোর্ট বলে দিচ্ছে ইসরাঈল পানির জন্য বাধার পরবর্তি যুদ্ধটি। ইহুদীরা ইসরাঈল রাষ্ট্রের পতাকায় পানির দুই নীল রঙ দিয়ে রেখেছে। যা নীল ও ফোরাত নদীর ইঙ্গিতবাহী। এর মানে হলো পানি ও নদীর বিষয়টি ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্মমূলে জড়িয়ে আছে। ইহুদী রাষ্ট্রটি হাজার হাজার ইহুদীর জন্য বসতি স্থাপন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিগত শতকের শেষ দিকে ১৫ লক্ষ ইহুদীদের বসতি স্থাপনের জন্য পাঁচসালা কার্যক্রম সে গ্রহণ করে। এই বসতির জন্যে নতুন জমি যেভাবে দরকার, তেমনি প্রয়োজন বিপুল পানির। ইহুদীরা তাদের জন্য ৯০ কিউসেক পানি সরবরাহ করবে। এবং সবচে কম পানি ব্যবহার করে জীবনযাপনের জন্য সব ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ইসরাঈলের মজুদ পানি কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। দখলীকৃত এলাকাগুলোতে শুষ্কতা বেড়েই চলছে। পানির উৎসগুলো মরে যাচ্ছে, সঞ্চয় ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ সংকট উত্তরণে সিরিয়া ও লেবাননের নদী ও ঝিলগুলোর উপর দখল প্রতিষ্ঠা ইসরাঈলের জন্য জরুরী। যদিও তুরস্ক থেকে পানি

তারা পাচ্ছে, কিন্তু সিরিয়া ও লেবাননের পানির উৎসগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

আরেকটি ইস্যু হলো মিলেনিয়াম কেন্দ্রীক ধর্মীয় উন্মাদনা। চরমপন্থী ইহুদীও তাদের সমমনা খ্রিস্টানরা তৃতীয় সহস্রাব্দের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী ও ধর্মীয় অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন দেখতে উদগ্রীব। এ কারণে তারা উগ্র চিন্তা চেতনার ব্যাপক বিস্তারে প্রয়াসী। উগ্র ইহুদীদের মধ্যে তো সহস্রাব্দ আসার সাথে সাথে যুদ্ধের পিপাসা বেসামাল হয়ে উঠেছে। তাদের দৃষ্টিতে এ সময়টাই হচ্ছে ইহুদীদের শেষ সুযোগ। এটা ধর্মীয় জাগরণ ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করার মহা মৌসুম। এ সময়েরই শেষ পাদে ইহুদী পয়গাম্বরের আগমন ঘটবে, যার প্রতীক্ষা তারা করছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

অপরদিকে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিশ্বাস হলো এ সহস্রাব্দের শুরুতেই ঈসা মসীহ পৃথিবীতে আসবেন। বায়তুল মোকাদ্দাসে সিংহাসন স্থাপন করে এক হাজার বছর পৃথিবী শাসন করবেন। যিশু খৃস্টের আগমনের জন্য শত্রুকবলিত মধ্যপ্রাচ্যে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ প্রয়োজন। এ যুদ্ধ যতোই দ্রুত হবে, খ্রিস্টানদের ততোই লাভ। কেননা যুদ্ধ বাঁধলেই আসবেন ইসা মসীহ। প্রতিষ্ঠা করবেন খৃস্টিয় শাসন। ইহুদীরা তাদের সৌভাগ্যকে স্বাগত জানাবার জন্যে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে গুড়িয়ে দিয়ে হাইকলে সোলেমানী নির্মাণের দিকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই নির্মানের মাধ্যমে ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ এক ধর্মীয় শর্ত পূরণ হয়ে যায়।

মিসরের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ফওজি মুহাম্মদ তায়েলের ভাষ্যমতে– যায়নবাদী দর্শনের প্রাণ ভোমরা হলো দুটি। প্রথমত ইসরাঈলী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত বায়তুল মোকাদ্দাস ভেঙে হাইকেল সোলেমানী তৈরি। অতএব হাইকলের প্রশ্নে ইহুদীরা এক চুলও পিছু হটবে না। যে কোন কিছুর বিনিময়ে তারা এটা নির্মাণ করবেই। এজন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি তারা নিয়ে রেখেছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ আসলেই বাজিয়ে দেবে যুদ্ধের ডংকা। হাইকলে সোলেমানী তৈরির তোড়জোড় সেই যুদ্ধ দাঁত কিলিয়ে হাসছে।

বেথেলহেম ২০০০ ঃ খ্রিস্টীয় মৌলবাদের নতুন বিস্ফোরণ

তৃতীয় সহস্রাব্দের আগমন নিয়ে দুনিয়ার অধিকাংশ সম্প্রদায় উৎসাহী ছিলো। কিন্তু খ্রিস্টানদের কাছে এটা নিছক উৎসাহের নয়, বরং আরোও কিছু। অতীতের যে কোন সময় থেকে আজকের পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি। খ্রিস্টান বিশ্ব তাই কোনো বিষয়ে অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদর্শন করলে বিষয়টি সারা দুনিয়ার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু না হয়ে পারে না। তৃতীয় সহস্রাব্দের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

তৃতীয় সহস্রাব্দের সাথে ঈসা (আঃ) এর সম্পর্ক প্রগাঢ়। তার আগমনের পর দুই হাজার বছর অতিক্রান্ত। এখন তার পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষা খ্রিস্টবিশ্বে, তারা চাচ্ছে ঈসা (আঃ)-এর নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় অতিক্রান্ত হবে এ সহস্রাব্দ। সুতরাং এটা শুধু ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ২০০০ বছর স্মরণের বিষয় নয়, এ হচ্ছে এক নতুন পৃথিবীর উদঘাটিকা। এক স্বর্গীয় সম্ভাবনার হাতছানি। ঈশ্বরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নতুন যুগ। এই যুগ সারা বিশ্ব আসবে খ্রিস্টানদের হাতে। ঈসা (আঃ) এর নেতৃত্বে। তবে ঈসা (আঃ) রোম ওয়াশিংটন কিংবা প্যারিসে আসবেন না, তিনি আসবেন আলকুদসে যে জনপদের ক্রোড়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রথম। সেই জনপদে লালিত-পালিত হন তিনি। সেই জনপদের পৃষ্ঠে বিচরণ করেছেন, যাপন করেছেন হায়াতের বড় এক অধ্যায়। খ্রিস্টানদের কাছে কুদস শহরের গুরুত্বের শেষ নেই। এই শহর জন্মের শহর, প্রত্যাবর্তনের শহর, কবরস্থ হওয়ার শহর এ শহরই সব কিছু।

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে ইহুদীরা চিরদিনই শত্রু ভেবেছে। নিজেদেরকে তারা মুসা (আঃ) এর যথার্থ অনুসারী ভাবতো। যে নবীর মিশনও দাওয়াতকে পূর্ণতা দেয়ার জন্যই ঈসা (আঃ) এসেছিলেন পৃথিবীতে। এ ভিত্তিতে কুদস শহরের উত্তরাধিকারকে খ্রিস্টানরো নিজেরা অধিকতর জ্ঞান করতো। খ্রিস্টান আকিদার কুদস শহরটি দাঁড়িয়ে আছে আবেগের কেন্দ্রস্থলে। খ্রিস্টানরা একে ঈসা (আঃ) এর মিরাজ হিসেবে জানে। তারা একে সহয়ুন বলতে রাজী নয়, বরং এ হচ্ছে নিউ টেস্টামেন্টের শহর। এ শহর তাদের মতে মসীহের শহর। ঐতিহাসিকভাবে বিশ শতক পর্যন্ত কুদসের সাথে খ্রিস্টানরা এই সম্পর্ককে বজায় রাখতে চেয়েছে। তাদের মধ্যে মতানৈক্য প্রচুর। এমনকি ঈসা মসীহ (আঃ) সম্পর্কেও মতানৈক্য প্রকট। আল্লাহ পাক ও ঈসা মসীহ (আঃ) সম্পর্কে গুরুতর বিশটি ভিন্নমত ও ভিন্নধারা তাদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বেথেলহেমের পবিত্রতা নিয়ে কোনো মতানৈক্যই তাদের মধ্যে নেই। এটি সেই শহর যেখানে জন্ম হয়েছিলো ঈসা মসীহের (আঃ)। আর নাসেরা যেখানে নাকি শুলিতে চড়ানো

হয়েছিলো মসীহ (আঃ)-কে, এর পবিত্রতা নিয়েও কোনো ভিন্নমত নেই। ঠিক তেমনি কুদস শহর খ্রিস্টানদের কাছে প্রশ্নাতীতভাবে পবিত্র। সেখানে নাকি কবরস্থ করা হবে মসীহ (আঃ)-কে।

গোমরাহীর ইতিহাস ঃ পারাক্লিতস তথা সে নবীর শুভাগমন সম্পর্কে ঈসা মসীহ (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, খ্রিস্টানদের উচিত ছিলো সেই নবীকে মেনে নেয়া। এই মেনে নেয়ার পিছনে রয়েছে সেই যুক্তি, যে যুক্তির ভিত্তিতে তারা ইহুদীদের আহ্বান জানিয়েছে মসীহ (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস পোষণের জন্য। কারণ মসীহ (আঃ)-এর আগমনের পূর্বাভাস নাকি রয়েছে মুসা (আঃ)-এর বাণীতে। যে নীতি নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলো, সেই নীতি কিন্তু ইসলামের বেলায় তারা প্রয়োগ করতে চাইলো না। সেটা চাইলো না হিংসা ও শত্রুতার কারণে। আর অনেকেই ইহুদী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইসলামের নিকটস্থ হতে চাইলো না। এর ফলাফল খুব একটা ভালো হয়নি। ইসলাম থেকে তাদের বিদ্বেষ প্রসূত দূরত্ব এক সময় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। ফলে তারা হামলে পড়লো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। সংগঠিত হলো মোতার যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ হয়ে এদের বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিরোধের যে সিলসিলা জারি হয়, তা ইয়ারমুক পর্যন্ত পৌঁছেও শেষ হলো না। খ্রিস্টানরা একের পর এক কালো যুদ্ধের মেঘমালা পাঠিয়ে দিচ্ছিলো ইসলামী মানচিত্রের দিকে। মুসলমানদের গৌরবময় সময়ের পরও এ ধারা অব্যাহত ছিলো। ক্রুসেডের যুদ্ধগুলো ছিলো খ্রিস্টানদের উন্মাদনারই বহিঃপ্রকাশ। সেই উন্মাদনা সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর (রহঃ) হাতে মার খেয়েও দূর হয়নি। যার প্রমাণ মিলে ফরাসীরা দামেশক কব্জা করে নেয়ার পর আইয়ুবীর (রহঃ) কবরে দাঁড়িয়ে জেজল গ্যাম্বী বলেছিলেন— 'সালাহ উদ্দীন। আমরা ফিরে এসেছি।' ক্রুসেডের সময় বুঝা গিয়েছিলো খ্রিস্টানদের মন-মগজে বায়তুল মোকাদ্দাস কেন্দ্রীয় গুরুত্ব নিয়েই বিরাজমান। গুলিখচিত পতাকার নিচে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান মুসলিম নিধনে অংশ নিলো। মুসলমানরা রুখে দাঁড়ালে মানবেতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘতর যুদ্ধ সংগঠিত হলো। এ যুদ্ধের উত্তেজনা ও খৃস্টীয় আবেগকে সম্বল করে পোপদের সাজানো ছকে ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হলো।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ও খৃস্টীয় ১১ শতকের প্রথম দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে খৃস্টীয় পনেরো শতক পর্যন্ত। এ সময়ে ইসলামী সীমানার উপর উত্থাল তরঙ্গের মতো বিপুল বাহিনী নিয়ে পনেরো বার আছড়ে পড়ে খৃস্টীয় দুনিয়া। এতে অংশ নেয় গোটা ইউরোপ। প্রথমদিকে ক্রুসেডাররা জয়ী হয়েছিলো। বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। মসজিদে আকসার মিনারগুলোতে

৮০ বছর ক্রোশ অঙ্কিত পতাকা উড়েছিলো। এই যুদ্ধ মনে হচ্ছিলো আর থামবেই না। কিন্তু খ্রিস্টানরা যখন বুঝলো যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দখলে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তখনই তারা ক্ষান্ত হলো। তারপর স্বল্প বিরতি। ইউরোপ নিজের ক্ষতস্থান শুকাতে চাইলো। নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে অধিক মনোযোগী হলো। অতঃপর এলো ষোল শতক, নতুন অভিযানের ডাক নিয়ে।

খ্রিস্টীয় ইতিহাসে বিপ্লব

ষোলো শতকে ইউরোপে এলো নয়া বিপ্লব। প্রোটেস্টান্ট সংস্কারবাদী আন্দোলনের পথ ধরে সূচিত এ বিপ্লব খ্রিস্টীয় ইউরোপের খোল নইচে বদলে দিলো। এ পরিবর্তন সংগঠিত হলো এমনভাবে, যাতে ফায়দার বিপুলাংশ ঢুকে গেলো ইহুদীদের ঘরে। প্রোটেস্টান্ট এই আন্দোলন বাইবেলের ব্যাখ্যার উপর গীর্জার ইজারাদারীকে চ্যালেঞ্জ করলো। এর ফলে ইহুদীদের এই লাভ হলো যে তাওরাতের শাব্দিক অনুবাদ প্রাধান্য পেলো। প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ইঞ্জিলের পাশাপাশি তাওরাতকে ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস করতো। এ আন্দোলনের ভ্রূণ গজিয়ে উঠেছিলো খ্রিস্টিয় পনেরো শতকে।

সতেরো শতক আগমনের সাথে সাথে ইহুদীদের সম্পর্কে ইউরোপে নতুন ভাবধারা তৈরি হলো। প্রোটেস্টান্টরা ইহুদীদেরকে নিজেদের সাথে মিশিয়ে নিতে চাইলো। এবং আল-কুদসে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলো তাদের নিয়ে। তাদের বিশ্বাস মতে কুদসে ইহুদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই ঈসা মসীহের আগমন ত্বরান্বিত হবে। গীর্জা প্রদত্ত ব্যাখ্যা পরিহার করে বাইবেলের শাব্দিক তর্জমাও বিশ্লেষণ থেকে তারা বুঝলো যে ঈসা মসীহ (আঃ) পৃথিবীতে এলে ইহুদীরা তার হাতে খ্রিস্টান হয়ে যাবে এবং যে সকল ইহুদী খ্রিস্টান হবে না, শত্রু হিসেবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর ঈসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে খৃস্টিয় সাম্রাজ্যের অধীনে পৃথিবী শাসিত হবে এক হাজার বছর।

বাইবেলের ইউহান্নার স্বপ্ন অধ্যায়ে বলা হয়— আমি দ্রুত আসবো। যা কিছু তোমাদের কাছে আছে, দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। অন্য কেউ যেনো তোমাদের মুকুট ছিনিয়ে না নিতে পারে। শত্রুর উপর তোমাদরে যে জয়ী হবে, আমি তাকে আল্লাহর হাইকলের খুটি বানিয়ে দেবো। সে আর বের হবে না হাইকল থেকে। আমি তার উপরে খোদা ও খোদার শহরের নাম লিখে দেবো। লিখে দেবো—নয়া জেরুসালেম।' আরও বলা হয়— তারা মহান ও পবিত্র, প্রথম কিয়ামতে যারা অংশগ্রহণ করবে। দ্বিতীয়বার তারা আর কখনো মরবে না। বরং তারা হবে আল্লাহ

ও মসীহের জ্যোতিষী। তাদের নিয়েই তিনি বিজয়ী হয়ে থাকবেন এক হাজার বছর। যখনই এক হাজার বছর পূরা হবে, সাথে সাথে শয়তান দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসবে। (পলের দ্বিতীয় পত্র, অধিবাসীদের নামে)

মসীহের হাতে বহু ইহুদী ঈমান আনবে, এ বর্ণনা বাইবেলে আছে– আল্লাহ তার মহিমান্বিত আওয়াজ দ্বারা জমিন-সমুদ্রে বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলবেন— দেখো আল্লাহর বান্দাদের কপালে মোহর মারার আগ পর্যন্ত জমিন-সমুদ্র ও বৃক্ষের ক্ষতি হয়, এমন কিছু করো না। যাদের উপর মোহর পড়বে, তাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৪ হাজার। এরা হবে বনী ইসরাঈলের প্রতিটি গোত্র থেকে। (দানিয়ালের ভ্রমণ বিশ্লেষণ, নাশিদ হান্না, ৬১)

ঈসা মসীহের (আঃ) প্রত্যাবর্তন জেরুসালেমে হবে এবং নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দিকেই হবে। এমন এক সময়ে হবে, যখন জেরুসালেমে ইহুদী বসতি থাকবে। অতএব ঈসা মসীহ (আঃ) আসতে হলে জেরুসালেম ইহুদী বসতি থাকা দরকার। জেরুসালেম যদি ইহুদীতে পূর্ণ না হয়, তাহলে খ্রিস্টানদের সব স্বপ্নই মারা যাবে।

প্রত্যাবর্তন অথবা দখলদারী ঃ

প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন খৃস্টবাদে সংস্কারের যে জমি তৈরি করেছিলো, এতে গজিয়ে উঠলো ইহুদী-খ্রিস্টান বন্ধুত্বের চারাবৃক্ষ। খ্রিস্টানরা এই সংস্কারের পর থেকে ইহুদীদের দিকে বাড়িয়ে দিলো সহযোগিতার হাত। কিন্তু এই সহযোগিতাকে এতো সহজেই ব্যক্ত করা সহজ নয়। কারণ বর্তমান যায়নবাদী আন্দোলন মূলত প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের প্রসবকৃত জারজ সন্তান। হার্জেলের মাধ্যমে তা বিকশিত হয় মাত্র।

আমেরিকান ইহুদী নেতা কীনন 'ইহুদী প্রতিরক্ষার পথ' নামক গ্রন্থে লিখেন— ইসরাঈল একটি রাজনৈতিক যায়নবাদী আন্দোলন হয়ে উঠার আগে নিহিত ছিলো এক খৃস্টীয় তত্ত্বের মধ্যে। প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানরা যায়নবাদের অস্তিত্ব গড়ে দিলো। এবং ডাক দিয়ে ইহুদীদের সমবেত করলো আন্দোলনের চারপাশে। ফিলিস্তিনকে ইহুদী রাষ্ট্রের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার প্রশ্নে হার্জেল যখন অমত জ্ঞাপন করলেন, তখন প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান মিশনারী ইউলিয়াম ব্লেটসন তাওরাতের একটি কপি তার কাছে পাঠালেন। কপিটিতে এমন প্রতিটি জায়গায় দাগ দেয়া ছিলো, সেখানে উল্লেখ ছিলো ইহুদীরা শেষ জামানায় বায়তুল মোকাদ্দাসে জমা হবে। হার্জেল পাঠ করে আশ্বস্ত হলেন এবং আন্দোলনে দাঁড়িয়ে গেলেন। (রুইয়ার সফর বিশ্লেষণ, নাষিদ হান্না ৩০৩, ৩০৭)

১৮৮৭ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে প্রথম যায়নবাদ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলে প্রোটেস্টান্ট পাদ্রি ইউলিয়াম হাশলর সেখানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কনফারেন্স হলে হার্জেলের সাথে প্রবেশ করলেন। এবং হার্জেলের সম্মানে শ্লোগান তুললেন— জয় সম্রাট হার্জেল, জয় সম্রাট হার্জেল।

ইউলিয়ামের বক্তব্যের পালা এলো। তিনি দাঁড়ালেন। খুবই তেজোদীপ্ত স্বরে তিনি বললেন— ইসরাঈল সন্তানরা, সচেতন হও। জেগে ওঠো। প্রভু তোমাদের আহ্বান করছেন পবিত্রভূমিকে রাজ্য বানাবার জন্য।

এই কনফারেন্স পরবর্তী পরিস্থিতি সবার জানা। ব্রিটেনের প্রেসিডেন্টরা প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ফিলিস্তিনকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তারপর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের রাষ্ট্র তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ব্রিটিশরা বাহ্যিকভাবে ইহুদীদের রাষ্ট্র গঠনে নিছক সহযোগিতার ভান করছিলো, কিন্তু তলে তলে ইহুদীদের তারা নানাভাবে উস্কিয়ে দিচ্ছিলো যেনো যে কোন উপায়ে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র তৈরির ইংরেজ উদ্দীপনার কারণ বর্ণনা করা ইহুদী নেতা হায়েম রাজেন তার ডায়রিতে লিখেন— কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ইংরেজরা ইহুদী রাষ্ট্র গঠনে এতো অনুপ্রাণিত কেন ? উত্তর সহজ। ইংরেজরা ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে সবচে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। এ কারণে ওল্ড টেস্টামেন্টের ধারক-বাহক হিসেবে আমাদের স্থায়ী রাষ্ট্রের অভিপ্রায় পূরণের লক্ষ্যে ধার্মিক ইংরেজরা এগিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশ গীর্জাগুলো এক্ষেত্রে আমাদেরকে যে সহযোগিতা দিয়েছে, তা অবিস্মরণীয়।

প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ও আমেরিকা ঃ

প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের প্রভাব আমেরিকার পড়ে এ্যাংলো স্যাক্সনদের মাধ্যমে এরা স্বদেশ ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস শুরু করে। এরা আমেরিকার শক্তি সামর্থ্যে নতুন মাত্রা এনে দেয়। এবং প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনকেও সেই সাথে বলিষ্ঠ করে তুলে। পরবর্তীতে ধর্মীয় আকিদার সাধারণ স্তর পেরিয়ে প্রোটেস্টান্টদের আবেগ পথভ্রষ্ট হয় এবং উগ্রমৌলবাদে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭০ এর দশকে আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট মহলে চরম প্রান্তিক তৎপরতা লক্ষণীয় হয়। এরা ওল্ড টেস্টামেন্টের আক্ষরিক অনুসরণে অধিক গুরুত্ব দেয়। এদেরই বৃহত্তর এক সংগঠন-খ্রিস্টান-যায়োনিস্ট আন্দোলন।

কখনো এদেরকে ডানপন্থী এ্যাংলিকান হিসেবে ভাবা হয়। কিন্তু খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীদের প্রতি তাদের অস্বাভাবিক ঝোঁক বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আসলে

এরা ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতিটি বর্ণের আনুগত্য করতে চায়। সেখানে সহয়ূন পাহাড়ের পবিত্রতার কথা আছে। এ কারণে ইহুদী রাষ্ট্রের সবটাই পবিত্র ও সমর্থনযোগ্য এই মনোভাব তারা পোষণ করে। তারা চায় মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রীক তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হোক। এবং ইহুদীদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা অর্জন করুক।

শেষ তিন দশকে খৃস্টীয় ইউরোপে ইহুদীদের পক্ষে ঐতিহাসিক কিছু পরিবর্তন সংগঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে ইহুদীরা কুদস শহরে দখল প্রতিষ্ঠা করলে তারা ভাবতে লাগলো, তাওরাতের অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীও চূড়ান্ত সত্য। এগুলোও বাস্তবায়িত না হয়ে পারে না। তাওরাতইঞ্জিলের প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তা অর্জন করলো আরও।

কেননা তাওরাতে বলা আছে— 'ইহুদীরা কুদস শহর দখল করবে।' হাল ল্যান্ডসি 'জমিনের তারা মহাপতনের দিকে' গ্রন্থে লিখেছেন— ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে সবকিছুই ছিলো রহস্যাবৃত তত্ব। পরে যখন ইসরাঈল বাস্তব হয়ে উঠলো, বুঝা গেল, ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হয়ে গেছে। দুনিয়ার দৃষ্টি ধাবিত হলো মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। সবাই বুঝলো যে শেষ জামানায় ইহুদীদের রাজধানী পবিত্র গ্রন্থের কথা মতো বায়তুল-মোকাদ্দাসই হবে।

আমেরিকায় খ্রিস্টান-যায়োনিস্ট আন্দোলন কয়েক বছরের মধ্যে বন্যার মতো চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করলো। সত্তরের দশকে এ আন্দোলনের বিকাশের পাঁচ বছর পরে বিভিন্ন জরিপে দেখা গেলো এর অনুকরণে আমেরিকায় ২৫০টি এ্যালিংকান সংস্থা তৈরি হয়ে গেছে। এরা প্রত্যেকেই ইসরাঈলের সহযোগী। ৪০ মিলিয়ন এ্যাংলিকান আমেরিকার গরিষ্ঠসংখ্যক নাগরিকের আবেগের প্রতিনিধিত্ব করে। এরা ইহুদীবাদের পক্ষে ব্যাপক গণরায় সৃষ্টির লক্ষ্যে 'ইসরাঈলের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা, সেমিনার-সেম্পোজিয়াম ইত্যাদির আয়োজন করে। কোনো কোনো সংগঠন পবিত্রভূমিতে পর্যটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পত্র প্রকাশ করে। কোনো কোন সংগঠন ইসরাঈলের আর্থিক সহযোগিতা ও রাজনৈতিক সমর্থন জ্ঞাপনে বিশেষভাবে সক্রিয়। এই সব সংগঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো— ইসরাঈলের পবিত্র ভূমি 'পুনরোদ্ধার'সহ প্রতিটি প্রকল্পে আমেরিকা-ইউরোপের সর্বাত্মক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

বেঞ্জামিন শেনইয়াহু যখন জাতিসংঘে ইসরাঈলের দূত ছিলেন, তখন এ্যাংলিকান সংগঠনগুলোর নেতাদের সহযোগিতার স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৮৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন— 'আমাদের ধর্মীয় বর্ণনাগুলো ইসরাঈলের পবিত্রভূমি

অধিকারের স্বপ্ন জাগিয়ে রেখেছে আমাদের হৃদয়ে। দুই হাজার বছর ধরে এই স্বপ্ন আমরা দেখে আসছি। কিন্তু লজ্জার ব্যাপার হলো স্বপ্নের বাস্তবায়নে প্রকৃত উদ্যোগ গ্রহণের কৃতিত্ব আমাদের নয়, সেটা খ্রিস্টান-যায়োনিস্ট আন্দোলনের।' তিনি আরো বলেন— 'খ্রিস্টান বন্ধুরা চমৎকার এক স্বপ্ন ও কাহিনীকে বাস্তব রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। যারা ইহুদী-খৃস্টানের এ বন্ধুত্বে বিস্মিত, তারা আসলে এই দুই সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক সম্পর্কের তাৎপর্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত নয়। এ এক ঐতিহাসিক অংশীদারিত্ব, যার ভিত্তিতে ইহুদী স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নে খ্রিস্টিয় সাধনা নিষ্ঠার সাথে নিয়োজিত আছে।'

আমেরিকান কংগ্রেস ইসরাঈলের প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নকে নিজের কাজ বলেই যেনো ধরে নিয়েছিলো। ১৯৯৫ সালের ২৪শে অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেসে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক একটি বিল পাস হয়। বিলটিতে বলা হয়– তেল আবিব থেকে ইসরাঈলী রাজধানী জেরুসালেমে স্থানান্তরিত করার জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান করা হোক।

বিলটির পক্ষে পড়ে ৪০২ ভোট বিপক্ষে পড়ে মাত্র ১১৭ ভোট। পার্লামেন্ট সদস্যরা শর্ত রাখেন সর্বোচ্চ ১৯৯৯ এর ৩১শে মের মধ্যেই রাজধানী যেনো স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলায় রাজধানী স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয় সর্বোচ্চ ৬ মাস সময়। অর্থাৎ ২০০০ সালের শুরু পর্যন্ত। নিউইয়র্ক টাইমসে ১৯৯৭ সালের ১৫ এপ্রিল এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এতে বড় বড় বিশপ ও পাদ্রীদের দস্তখত ছিলো। যারা সম্মিলিত কুদস ফাউন্ডেশনে খ্রিস্টান সংগঠনগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধি।

এই ঘোষণায় বলা হয়— এই ঐক্য আল-কুদসে ইসরাঈলের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করছে। বিগত দুই হাজার বছর ধরে তাওরাত-ইঞ্জিনের হুকুম মতে জেরুসালেমকে ইহুদীদের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে সবাই মানছে। এবং ঘোষণা করে বলে দেয়া হয়েছে— লোকেরা যেনো কুদসের যুদ্ধে দল বেধে অংশগ্রহণ করে। যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে সারি সারি ইহুদী দল বেধে দাঁড়িয়ে যাবে। ঘোষণায় আমেরিকানদের বলা হয় তারা যেনো অতি দ্রুত আমেরিকান দুতাবাসকে জেরুসালেমে স্থানান্তরিত করার জন্য হোয়াইট হাউসের দিকে চিঠির স্রোত পাঠাতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত আমেরিকা প্রশাসন এই দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৯৯ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের আবাসিক ভবন জেরুসালেমে স্থানান্তরিত হয়। আবাসিক ভবন স্থানান্তর মানে গোটা দূতাবাস স্থানান্তর। তারপর

আর বেশি দিন যায়নি। মহাধুমধামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস পূর্ণাঙ্গভাবে স্থানান্তরিত হয় জেরুসালেমে।

ভ্যাটিকানের কাহিনী ঃ ভ্যাটিকান ঐসব ক্যাথলিক খ্রিস্টানের দৃষ্টিভঙ্গির ভাষ্যকার, যারা মনে করে ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করেছে। তাকে দাফন করা হবে জেরুসালেমের পবিত্রভূমিতে। এ করণে কুদস শহরে ইহুদী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান। ইহুদী প্রত্যাবর্তনকে তারা কখনো সমর্থন করেনি। কিন্তু ইহুদীরা কুদস শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরে ভ্যাটিকান দ্বিতীয়বার এ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা শুরু করে।

১৯৬১ সালে গীর্জাসমূহের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ইহুদী বিরোধিতা ত্যাগ করে যায়নবাদী কর্মকাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য প্রদান শুরু হয়। ইহুদীদেরকে ঈসা (আঃ) হত্যার ঐতিহাসিক দায় থেকে মুক্ত করা হয়। সরকারিভাবে সেই দায়মুক্তির ঘোষণা দেয়া হলো। ক্যাথলিক গীর্জা সমূহের বক্তব্য ও পুস্তকাদি থেকে এ সম্পর্কিত আলোচনা প্রত্যাহার করা হয়। যাতে ইহুদীদের অপরাধ চিহ্নিত হয়। এমন কি মিসরের পোপ ও ইহুদীদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাতের সময় পোপ অবনত হয়ে শিমন পেরেজর সাথে মোসাফাহা করেন। ১৯৯৩ সালে ভ্যাটিকান থেকে সরকারিভাবে ইহুদী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে তারা এখনো কুদস শহর ইহুদীদের রাজধানী হবার বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বৈশ্বিক প্রাণকেন্দ্র ভ্যাটিকান প্রস্তুত নয় ইহুদী কিংবা মুসলমানদের রাজধানী হিসেবে বায়তুল মোকাদ্দাসকে মেনে নিতে। কেননা ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের মতে জেরুসালেমহলো ঈসা (আঃ)-এর নির্ধারিত রাজধানী।

ফিলিস্তিনের খ্রিস্টানরা ঃ ফিলিস্তিনী খ্রিস্টানরা জেরুসালেমের খ্রিস্টিয় নেতা পেট্রিয়ার্কের প্রবর্তিত নীতির অনুসরণ করলো। তাদের নীতিটি হলো জেরুসালেমকে নিরুপদ্রব থাকতে দাও। ১৯৯৫ সালের ১৪ নভেম্বর পেট্রিয়ার্ক একটি কর্মনীতি প্রকাশ করেন। তাতে জেরুসালেম সম্পর্কে বলা হয়— এটি হচ্ছে মানবজাতির ভিত্তিভূমি। প্রভু এই শহরকে বাছাই করেছেন নিজের অবস্থানের জন্য। পবিত্র গ্রন্থ সুসংবাদ দিয়েছে এ শহরে ঈসা মসীহ (আঃ) আগমন করবেন। সবার অশ্রু মোছে দেবেন তিনি। জেরুসালেম সকল খ্রিস্টানের জন্য জীবনীশক্তি। সেখানে অবস্থান করা মানে প্রভুর গৃহে অবস্থান করা। মোটকথা দুনিয়ার সকল খ্রিস্টান-এর উপর একমত যে কুদস মুসলমানদের হাতে যেনো না থাকে। কিন্তু সেটা ইহুদীদের হাতে থাকবে কি থাকবে না, এ নিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে রয়েছে ভিন্নমত।

প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানরা তো ইহুদীদের পক্ষে এক পায়ে খাড়া। সেটা জানাই আছে। প্রোটেস্টান্টদের আন্তর্জাতিক মিশনারী সমন্বয় সংস্থা জেরুসালেমে ইহুদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উৎসাহী সমর্থক। ১৯৯৩ সালে ইয়েনবেল ডারউইন তার 'ব্যবিলন বা জেরুসালেম' গ্রন্থের জেরুসালেম অধ্যায়ে প্রোটেস্টান্টদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে লিখেন— খ্রিস্টান মিশনারী বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে মুসলমানদের দাবীকে কোনোভাবেই মেনে নেবে না। ইহুদীদের ব্যাপারে তাদের নীতি হলো উদার। ইহুদীরা বায়তুল মোকাদ্দাসে এবাদত করুক এতে তাদের অনীহা নেই। তাদের মতে জেরুসালেমে স্থায়ীভাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠা ইহুদীদের অধিকার। তিনি আরো লিখেন— আন্তর্জাতিক খ্রিস্টীয় নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস হলো ঈশ্বর এক সুদীর্ঘ সময়ের জন্য আল কুদসকে ছেড়ে দিয়েছেন। সময় শেষে দাউদ (আঃ) এর পুত্রের আকৃতিতে তিনি সেখানে প্রত্যাবর্তান করবেন। আশপাশের সমস্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শক্তি এসে তার কাছে সমর্পিত হবে। এটা শেষ সময়ের কথা। খ্রিস্টানদের স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করবে। তাদের অধিনে পৃথিবী হয়ে উঠবে শান্তি ও ন্যায়ের এক স্বর্গীয় কানন।

বেথলেহেম! বেথেলহেম!! ঃ বেথেলহেম হলো দুনিয়ার সমস্ত খ্রিস্টিয় তৎপরতার কেন্দ্রস্থল। খ্রিস্টানরা সহস্রাব্দকে সামনে রেখে বেথেলহেমের দিকে দৃষ্টি রেখে উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢল বইয়ে দেয়। কোনো কোনো পত্রিকার রিপোর্ট মতে ২০০০ সালের আগমনের এক বছর আগেই জেরুসালেমে ১ লক্ষ খ্রিস্টান সমবেত হয়। ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে যায় ২০ লাখ। এবং মিলেনিয়ামকে স্বাগত জানাবার জন্যে পোপের আগমন যখন নিশ্চিত হবে, তখন সেই সংখ্যা ত্রিশ লক্ষে পৌঁছে যাবে। (আখবারুল-আওসত, ৪।১।১৯৯৯) কেউ কেউ পরবর্তীতে বলেছেন– মিলেনিয়াম উৎসবে জড়ো হওয়া খ্রিস্টানদের সংখ্যা ষাট লক্ষে পৌঁছেছিলো। (আল-মুজতামে' ২/৩/১৯৯৯) বেথেলহেম খ্রিস্টানদের কাছে মর্যাদার, কিন্তু তা এখনই তাদের প্রয়োজন নয়। নতুবা ফিলিস্তিনের অধিনস্ত এ শহরটিকে তাদের কিছু লোক অগ্রসর হয়ে নিজেদের দখলে নিয়ে যেতে পারতো।

তৃতীয় সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাবার উসবে বিশ্বনেতৃবৃন্দও অংশ নেন। ভ্যাটিকানের পোপ, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রমুখ। মজার ব্যাপার হলো রাশিয়ার বরিস ইয়েলৎসিন কম্যুনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও বামপন্থার নামাবলী গা থেকে ছিড়ে ফেলে খ্রিস্টিয় এই আবেগের বন্যায় লীন হয়ে গেলেন। মিলেনিয়াম উৎসব আয়োজকদের সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য হয়ে গেলেন। সেই উৎসবের জন্য ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার বরাদ্ধ করা হয়। উৎসবে জর্ডানও অংশ নেয়। কারণ জর্ডানের আত্মগত সে ঈসা মসীহের (আঃ) ব্যাপটেসমিয়া দেয়া হয়। হাজার হাজার মুহাজির

খ্রিস্টান জর্ডানে অবস্থান করে। উৎসবে অংশ নেয় মিসরও। কিন্তু মৌলিকভাবে সব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিলো ফিলিস্তিনী প্রশাসনের উপর। কারণ বেথলহেম তো ফিলিস্তিনেই পড়েছে।

ইহুদীরা এই উৎসবের উচ্ছাসকে বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করতে চাইলো। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু শঙ্কা ও সন্দেহ তড়া করছিলো তাদের। কারণ তারা জানতো যে খ্রিস্টানরা বিশেষ এক কারণে ইহুদীদের সমর্থন করছে। বিশেষত এ্যাংলিকান খ্রিস্টানরা তো এজন্যই ইহুদীদের সাহায্য করছে যে ইহুদীরা জেরুসালেম অধিকার করলে ঈসা মসীহের আগমন ত্বরান্বিত হবে। সাধারণ ইহুদীরাও এ বিষয়টির প্রতি অসচেতন ছিলো না। ইসরাঈলী পত্রিকা 'কোলাম' এ রিপোর্টে ছাপা হয়— সাবেক প্রধানমন্ত্রী কোনইয়াহুর সাথে সম্পর্কিত সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান আগন্তুকের জেরুসালেমে জড়ো হওয়াকে ভালো চোখে দেখছে না। তাদের দৃষ্টিতে এটা সাধারণ নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর হবে। এই আশংকা প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। ইসরাঈল সরকার এই উৎসব ও মিছিলের শৃঙ্খলা বিধানের পাশাপাশি ইউরোপ-আমেরিকার মৌলবাদী রেডিক্যাল খ্রিস্টানরা যাতে এতে প্রবেশ না করতে পারে, এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখছে। এই সব র‍্যাডিকেল তৃতীয় সহস্রাব্দে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার বিশ্বাস পোষণ করে। তাদের অনেকেই কিয়ামত সংগঠিত হবার আগেই পবিত্রভূমিতে মৃত্যুবরণের লক্ষ্যে উদগ্রীব।

ইসরাঈলী প্রশাসন উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে এই গণসমাগম ও উৎসবমুখরতার সুযোগে ইসরাঈলের যে কোন লক্ষ্যস্থলে ইসলামী চরমপন্থীরা হামলা করে বসতে পারে। বিশ্বরাজনীতির ব্যাপারে এ্যাংলিকানদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে। তাদের মতে দুনিয়া খুব দ্রুত তার শেষ ধ্বংসের দিকে ছুটে চলছে। ভয়ানক নানা দাস্তান ও ধ্বংসাত্মক বিভিন্ন যুদ্ধের পরে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রজন্ম জন্মগ্রহণ করবে। এরা ঈসা মসীহের (আঃ) জামানায় শান্তির দেখা পাবে।

আমেরিকান যায়োনিস্ট গ্রিস হালসেল এক এ্যাংলিকান নেতার কাছে যুগ পরিস্থিতি ও পবিত্র ভূমি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এ্যাংলিকান নেতা বললেন— এটা আমাদের বিশ্বাস যে ইতিহাসের গতিধারা বিশ্বপরিস্থিতিকে বিশেষ একটা পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন সে যুগ এটাই সর্বশেষ সময়কাল। এর সম্মুখেই ঈসা মসীহের (আঃ) রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নীল সময়। সেই রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এক হাজার বছর। বহু ইহুদী সে সময় খ্রিস্টান হয়ে যাবে। এবং হয়ে যাবে খৃস্টীয় সাম্রাজ্যের গর্বিত অংশীদার। এটাই হবে দুনিয়ায় প্রকৃত সুশাসনের কাল। **আল কুদস রাজধানী হবে ঈসা মসীহের (আঃ)**

গ্রিস হালসেল প্রশ্ন করলেন এর আগে কী ঘটবে ?

এ্যাংলিকান নেতা বললেন (১) ইহুদীরা এই পবিত্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন করবে (২) ইহুদীরা রাষ্ট্র গঠন করবে এবং ২০০০ সালের পরে জেরুসালেম হবে তাদের রাজধানী। (৩) গীর্জা পুনরায় দুনিয়া জুড়ে তার প্রকৃত কর্মকাণ্ড চালু করবে। (৪) বাইবেলের বাণী দুনিয়ার প্রতিটি ইসরাঈল বহির্ভূত সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছে যাবে। (৫) দুনিয়ার নানা প্রান্তে বিস্ময়কর বহু ঘটনা ঘটবে। নানা দুর্যোগ দেখা দেবে। (৬) একটি পারমানবিক মহাযুদ্ধ পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। এটি হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুদ্ধ শেষে মসীহ (আঃ) আবির্ভূত হবেন। আমরা চাই সেই যুদ্ধটি হয়ে যাক। মধ্যপ্রাচ্যেই হোক যুদ্ধটা। এটা হবে নির্ঘাত এক মহাযুদ্ধ।

খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে এই বিশ্বযুদ্ধ না হলে ঈসা মসীহের (আঃ) আগমনই হবে না। ঈসা মসীহকে (আঃ) খ্রিস্টানদের চাই। অতএব বিশ্বযুদ্ধও চাই। কিন্তু সেই বিশ্বযুদ্ধ কী সর্বনাশ ডেকে আনবে পৃথিবীতে?

তৃতীয় সহস্রাব্দ ও মহাযুদ্ধের কালোমেঘ

আমরা কী পৃথিবীর শেষ সময়কালে পৌঁছে গেছি? যে দিনগুলো যাচ্ছে, সেগুলো কী দুনিয়া ধ্বংসের নিকটবর্তী সময়? পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে মহাযুদ্ধ এটা কি কল্পনা না বাস্তবতা? সেই মহাযুদ্ধ যদি হয়, তাহলে তা হবে কিয়ামতেরই এক আলামত? প্রশ্নগুলোর সুনিশ্চিত জবাব আমাদের হাতে নেই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি অদৃশ্য বিষয়ের সত্যিকার জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। তিনি বলেন— 'আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডলে অদৃশ্য বিষয় জাননেওয়ালা কেবল তিনিই।'

ঈমান ও কুফুরের মহাযুদ্ধ কিয়ামতের বিশেষ এক আলামত। সেটা শুরু হবে কখন, আল্লাহই ভালো জানেন। সুনির্দিষ্ট করে অকাট্যভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা আমাদের কাজ নয়। এ বিষয়ে জ্ঞান আমাদের প্রভুর কাছে রয়েছে। তিনিই একে ঘটাবেন নির্ধারিত সময়ে।' কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়ানোর প্রচলিত কথাটি প্রবল ধারণার পর্যায়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল ধারণার স্তরে তা রয়ে গেছে।

কিন্তু চরমপন্থী খ্রিস্টানরা দৃঢ়তার সাথে শেষ দিন ঘনিয়ে আসার আকিদা পোষণ করে ও আবেগের সাথে এর প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। কথিত 'শেষ সময়ের' সাথে তৃতীয় সহস্রাব্দের বিশেষ সংযোগে তারা বিশ্বাস করে। তাদের মতে তখন সব ধর্মের মানুষের দুনিয়া থাকবে না। দুনিয়া তখন কেবলই খ্রিস্টানদের হবে। যামানা তখন হবে কেবলই মসীহ সৈনিকদের।

এই সব আকিদাগত বিষয়ের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কটি হলো তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মানেই আমাদের বিরুদ্ধে রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে। শতাব্দীর শেষ লগ্নে শুনা যাচ্ছে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন দাবী। তারা দাবী করছে শেষ দিনগুলোর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ধাপ ইতোমধ্যে তারা অতিক্রম করে ফেলেছে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান সাফল্য হচ্ছে বায়তুল-মোকাদ্দাসে ইহুদীদের সফল প্রত্যাবর্তন। এর পরে আরো কিছু প্রস্তুতি সম্মুখে রয়েছে। যেগুলো সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে তারা তৎপর।

বিগত অধ্যায়গুলোতে আমরা পড়েছি, মসজিদে-আকসা শহীদ করে হাইকল তৈরি, লাল গাভী প্রকাশিত হবার হৈ চৈ, এবং কুদস শহরকে চরমপন্থী ইহুদী দ্বারা ভর্তি করে দেয়ার ব্যাপারে তারা কতোটা সক্রিয়। এগুলোর বাইরে আরেকটি বিষয় রয়েছে, সেটা সবকিছুর উপর গুরুত্বের দাবী রাখে। খ্রিস্টীয় ধারণামতে শেষ দিনগুলো যতই নিকটবর্তী হবে, ততই অনিবার্য হয়ে উঠবে সেই আলামত। সেই আলামতটি হলো মহাযুদ্ধ বা কিয়ামতে সুগরা। এই কিয়ামতই নিশ্চিত করবে পরবর্তী মহা কিয়ামতকে। মহাকিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না এ যুদ্ধ পৃথিবীতে সংগঠিত হবে। নব্বইয়ের দশকে এ যুদ্ধ নিয়ে পারমানবিক গ্রীষ্মকাল নামে একটি ফিল্ম তৈরি হয়। ১৯৯৯ নিউজ উইকে খবর ছাপা হয় যে– আমেরিকার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিজগুলোতে একটি ছবি নিয়ে তোলপাড় চলছে। ছবিটিকে 'শতাব্দীর ফিল্ম'। বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এই ছবির বাজেট ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ আমেরিকান ডলার। সিনেমার ইতিহাসে এই ফিল্ম এমন সাড়া তৈরি করেছে যার কোনো নজির কোথাও নেই।' ফিল্মটি প্রদর্শনের আগে আমেরিকান টাইমসে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে লিখা হয়– ৩৩ শতাংশ আমেরিকান তথা আট কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ এই ফিল্ম দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। (খলীজ টাইমস, ২৩/৫/১৯৯৯)

আমরা একে আমেরিকানদের ধর্মীয় উন্মাদনা সম্পর্কে মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা বলে অভিহিত করতে পারি না। বরং এ হচ্ছে বাস্তব অবস্থা, মিডিয়া যাকে প্রকাশ করেছে মাত্র। মিডিয়াগুলো সচরাচর আমেরিকানদের ধর্মোন্মাদনাকে রেখে ঢেকে প্রকাশ করতে চায়। তাদের সাম্প্রদায়িক উগ্রতা কোন পর্যায়ে ঠেকেছে, লোকদের তা জানাতে তারা আগ্রহী নয়। কিন্তু রিপোর্টে তার ছিটেফোটা প্রকাশ পেয়ে গেছে।

প্রোটেস্টান্ট এ্যাংলিকানরা খ্রিস্টীয় কনফেডারেশনের ব্যানারে আমেরিকার শক্তিশালী এক ধর্মোন্মাদনা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। জাতীয় রাজনীতিতে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে ভূমিকা রেখেই তারা ক্ষান্ত নয়, বরং রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের

হাতে তুলে নিতে তারা তৎপর। ১৯৯৪ সালে মার্কিন কংগ্রেস নির্বাচনে তারা অংশ নেয়। এবং রিপাবলিকানদের সাথে কোয়ালিশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এরা যখন তাদের গোপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাজির করতে লাগলো, রিপাবলিকানরা এতে সায় দেয়নি। খ্রিস্টীয় ফেডারেশন তখন পিরবালিকানদের হুমকি দেয়— দাবী না মানলে সামনের নির্বাচনে আমাদের সমর্থন পাওয়া যাবে না। রিপাবলিকানরা এতে কাত হয়ে যায়। তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয়। ফলে ১৯৯৮ এর নির্বাচনে উগ্রবাদীদের সহায়তায় রিপবলিকানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের আগে কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয়েছিলো ২০০০ সালের মধ্যে যদি তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নেবে। এমনকি তাদের এক নেতা বলেছিলেন— মৌলবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি অনীহা থাকলে রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক মৃত্যু হয়ে যাবে। ১৯৮৮ সালে রিপাবলিকান পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনে বিট রবার্টসন সভাপতিত্ব করেন। তিনি অন্তরঙ্গভাবে রিগ্যান বুশ প্রমুখের বন্ধু ছিলেন।

খ্রিস্টিয় ফেডারেশন ২০০০ সালের নির্বাচনের সুযোগ হাতছাড়া করেনি। ফেডারেশনের চেয়ারম্যান বিট রবার্টসন নির্বাচনের অনেক আগেই তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম আমেরিকান প্রশাসনকে মৌলবাদীদের হাতে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন। রিগ্যানকে ক্ষমতায় আনিয়েছিলো বিটের মৌলবাদী গ্রুপই। তারাই পরবর্তীতে বুশকে জয়ী করাবার কাজ হাতে নেয়। সিনিয়র বুশের পরবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন ক্লিনটন। তার প্রতিনিধি ছিলেন পপ জেল, তিনি এ্যাংলিকান মৌলবাদীদের সহায়তা পাননি। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যান। ক্লিনটন জিতলেন। ক্ষমতায় বসে ডেমোক্রেটিক হওয়া সত্ত্বেও ইসরাঈলের সহায়তায় ক্লিনটন এতোই ভূমিকা রাখলেন, মনে হলো কোনো এক মৌলবাদী নেতাই তিনি হবেন। ২০০০ সালের নির্বাচনে কোনো এক এ্যাংলিকানের হাতে আমেরিকার ক্ষমতা এ হবে ধ্বংসাত্মক, সর্বনাশা এক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর বিশাল এলাকা। বিরান হয়ে যাবে অজস্র জনপদ। এ যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র হবে ইসরাঈল। এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে ইসরাঈলের জন্যে। এক পক্ষে ইসরাঈলের শত্রু, অপরপক্ষে ইহুদী ও তার বন্ধুবর্গ।

তাওরাতের বক্তব্য— 'শেষ দিনগুলোতে সব এলাকা থেকে লোকেরা যখন ইসরাঈলে জড়ো হবে, তখন একে ঘিরে বিশাল এক ঘটনা ঘটবে। আরো বক্তব্য— অনেকদিন পরে শেষ সময়ে ইসরাঈলের পাহাড় সমূহ থেকে অসংখ্য

ইহুদী পবিত্র ভূমিতে সমবেত হবে। এই ভূমি অর্জিত হবে যুদ্ধের বিনিময়ে। সেটা আসবে প্রলয়ংকরী এক তুফানের মতো। তোমরা তখন মেঘমালার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের সমস্ত বাহিনী আর তোমাদের সঙ্গি বহু সম্প্রদায়।'

ইহুদীদের প্রতিপক্ষ শক্তিকে তাওরাতে গগ মেগগ তথা ইয়াজুজ-মাজুজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাওরাতের ভাষ্য মতে শেষ দিনগুলোতে একদিন দিগন্ত আচ্ছন্নকারী ধূলিঝড়ের মতো বিপদ ধেয়ে আসবে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে। ইসরাঈল ভূমিতে 'জুজ' আসবার দিন প্রভু বলবেন— আমার ক্রোধ বেড়ে যাচ্ছে। আমার ক্রোধের আগুনে আমার আত্মমর্যাদা। আমি কি বলিনি ইসরাঈল ভূমিতে এই দিবসের ভূমিকম্প সৃষ্টি হবে। এবং আমার সম্মুখে সমুদ্রের মাছ, শূন্যের পাখি, জঙ্গলের জানোয়ার, জমিনে বিচরণশীল পশু এবং ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল প্রাণী অবনত হবে। পাহাড় টুটে যাবে। সূর্য ভেঙে যাবে। আমি চাইবো প্রতিটি পাহাড়ে যেনো তরবারি গর্জে উঠে।' প্রভু বলেন— প্রতিটি ভাইয়ের তলোয়ার অন্য ভাইয়ের মাথার উপর ঘুরতে থাকবে। আমি তাদেরকে ধ্বংস ও রক্তের শাস্তি দেবো। আমি তাদের উপর, তাদের বাহিনীর উপর এবং তাদের সঙ্গি বহু সম্প্রদায়ের উপর ভয়ানক বৃষ্টি বর্ষণ করবো। তাদের উপর বর্ষিত হবে প্রস্তর বৃষ্টি, অগ্নি, বজ্র ও গন্ধকের ঝড়।'

তালমুদে আছে— শেষ দিনগুলোতে এমন সব ঘটনা ঘটবে, যার কেন্দ্রবিন্দু হবে ইহুদীরা। তালমুদে বলা হয়— ইহুদীদের শেষ সাম্রাজ্যের প্রথম প্রজন্ম সম্মুখীন হবে এক যুদ্ধের। এ যুদ্ধে দুনিয়ার দুই তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। ইহুদীরা বিজয়ের মাধ্যমে যে সকল যুদ্ধাস্ত্র অর্জন করবে, সেগুলোকে সাত বছর পর্যন্ত জ্বালাতে থাকবে।' এতো গেলো ধর্মগ্রন্থের কথা। অতি সম্প্রতি ইহুদীরা যে প্রটোকল তৈরি করেছে, সেখানেও এই যুদ্ধের দৃশ্য যেনো চোখ মেলে আছে। প্রটোকলে লিখা হয়— নবী-রাসূলদের (সাঃ) হেদায়েত ও শরীয়ত পড়ে বুঝেছি,— আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া শাসনের জন্য নির্বাচিত করেছেন। এজন্যে সর্বোচ্চ মাত্রার মেধা তিনি আমাদের দিয়েছেন। শত্রুদের মধ্যে যে অতি নিকৃষ্ট হবে, সেই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আমাদের বিরুদ্ধে, তারা যুদ্ধে নামবে পরাজিত হবার জন্যে। সেই যুদ্ধের কোনো নজির দেখেনি পৃথিবী। এবং তাদের বুদ্ধিমান লোকদের জন্য সেটা হবে এক অকল্পনীয় ধ্বংসের বিলম্বিত প্রহর।

ইহুদী উৎসগুলো শেষ যুদ্ধ ও সংঘাত সম্পর্কে এই আলোচনা পেশ করেছে। অপরদিকে খ্রিস্টিয় উৎস যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। ইহুদী উৎসের

চেয়ে অগ্রসর হয়ে খ্রিস্টিয় উৎস বলে দেয়, যেখানে যুদ্ধ হবে, সেটা ফিলিস্তিনের মাজদু প্রান্তর। ঈসা মসীহের (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের সময়ে সবচে লোমহর্ষক ঘটনা সেটাই হবে।'

স্বপ্ন অধ্যায়ে ঈসা (আঃ) এর জবানে নিজের প্রত্যাবর্তনের সময় সম্পর্কে বলা হয়— 'দেখো, আমি আগমন করবো একেবারে সন্তর্পণে। এ লোকটাই উত্তম, যে জাগ্রত থাকবে, নিজের কাপড়কে সুরক্ষিত রাখবে, যাতে করে উলঙ্গ হয়ে না চলে। লোকেরা তাহলে তার সর্বাঙ্গ দেখবে। সে তাদেরকে ঐ জায়গায় জড়ো করবে, হিব্রুভাষীদের কাছে সে জায়গার নাম 'হারমজেদ্দুন।' তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যুদ্ধ সংগঠিত হওয়া সম্পর্কে ইহুদী খ্রিস্টান উভয়েই বিশ্বাস পোষণ করে। ইহুদীরা মনে করে এ যুদ্ধ হলেই তাদের মুক্তি ঘটবে। খ্রিস্টানদেরও অনুরূপ বিশ্বাস। আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই দুই সম্প্রদায় নিজেদের মুক্তিকে এমন এক যুদ্ধের সাথে শর্তযুক্ত করে রেখেছে, যে যুদ্ধে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টান ছাড়া অন্য সবাইকে খুন করে ফেললেই তাদের মুক্তি ঘটবে। কী ধ্বংসাত্মক মুক্তি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুসের সমাধি রচনাকারী সেই যুদ্ধের জায়গা হবে হারমজেদ্দুন। হারমজে শব্দটি হিব্রু। হিব্রু ভাষায় যার অর্থ পাহাড়। হার শব্দ দ্বারা কোনো প্রান্তর বুঝাতে চাইলে মজদু শব্দটি যুক্ত করে হারমজদু বলতে হয়। ইঞ্জিনে শব্দটিকে 'এদগাম' করে হারমজদো– লিখা হয়। মজদু এলাকাটি তেল আবিব থেকে ৫৫ মাইল দূরে। পূর্ব হাইফা থেকে ৬০ কিঃ মিঃ ও ভূমধ্য সাগর থেকে ১৫ কি. মি. দূরে এর অবস্থান। পূরনো আমলে এই এলাকা সম্পর্কে বলা হতো— যে কমান্ডার এই এলাকা জয় করতে পারবে, সে যেকোনো শত্রুর মোকাবেলায় জিতে যাবে। শত্রুদের সংখ্যা যতই হোক, হারমজদো বিজেতাকে কেউই হারাতে পারবে না।

ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিশ্বাস— লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বহু বাহিনী মাজদো এলাকার আখেরী যুদ্ধে এগিয়ে আসবে। এ যুদ্ধে সকল বাহিনীই ধ্বংস হবে। তারপর যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। লেগে যাবে লেলিহান এক মহাসমর। খ্রিস্টানদের মতে এ যুদ্ধ চলবে সাত বছর। এই সময়ের মধ্যে ইহুদীরা বুঝতে পারবে খ্রিস্টধর্মই সঠিক। তারা দেখবে যিশু খ্রিস্ট কীভাবে শায়েস্তা করছেন ঈশ্বরের শত্রুদের। এরপরে ঈসা (আঃ) এর সত্যতায় তাদের কোনোই সংসয় থাকবে না। বাইবেলের ভাষ্য থেকে তাদের আকিদা তৈরি হয়েছে যে সাত মাস এমন অতিক্রান্ত হবে যাতে কেবলই ইসরাইলে মৃত্যুবরণকারীদের দাফন করে জমিন পাক করা হবে। এ্যাংলিকান প্রোটেস্টান্ট নির্বিশেষে সব খ্রিস্টানই হারমজদু-এর

বিষয়ে যারপর নেই উৎসাহী। ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সময় গুনছে ইউরোপ-আমেরিকায় প্রভাবশালী খ্রিস্টান গোষ্ঠীগুলো।

এ্যাংলিকান খ্রিস্টান ও শেষ প্রজন্ম ঃ তাওরাত ইঞ্জিলের যথেচ্ছা বিকৃতিকারী প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন এই বিকৃতির অন্ধঅনুসারীদের যুগ। এদের পরে আসবে এমন এক প্রজন্ম, যারা নিজেদের সর্বশেষ প্রজন্ম বলে দাবী করবে। তারা ইতিহাসের সমাপ্তি দেখতে চাইবে।

এদের আগমনের পথ তৈরি করছে আমেরিকা বৃটেন কানাডার এ্যাংলিকান খ্রিস্টানরা। আমেরিকায় এদের সংখ্যা নয় লক্ষ। সম্ভবত প্রোটেস্টান্ট এ্যাংলিকান উগ্রগোষ্ঠীগুলোর চেয়ে শয়তানের নির্ভরযোগ্য কোনো অনুসারী পৃথিবীতে নেই। এরা অক্ষরে অক্ষরে তাওরাত ইঞ্জিলের অনুসারী হওয়ার দাবী করে। তারা বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায় স্বহস্তে রচনা করতে চায়। সেটা লিখতে চায় রক্তের কালিতে, যুদ্ধাস্ত্রের কলমে। হারমাজদু তথা তৃতীয় মহাযুদ্ধ বা পারমানবিক হলোকাস্টের সময়টি তাদের খুবই প্রত্যাশিত। যা না হলে তাদের কর্তব্য সম্পাদিত হবে না। এ যুদ্ধ হবেই হবে এ্যাংলিকানদের এটাই বিশ্বাস। এ কারণে তারা ইউরোপে শোরগোল তুলেছে এবং ডামাডোল সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে এ বিষয়টি বুঝাতে তারা সক্ষম হয়েছিলো। লোকদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে তারা প্রচার পুস্তিকা বিলি করেছে, বক্তব্য দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের বক্তব্য দ্বারা এটাই প্রচার হচ্ছে যে এই প্রজন্মের সমাপ্তির আগেই মহাযুদ্ধকে সংগঠিত হতেই হবে। সানরেগো ম্যাগাজিনে ১৯৮৫ এর আগস্টে জেমস মেলজের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। জেমস ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া এ্যাসেম্বলির চেয়ারম্যান। তিনি-প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বলেছিলেন— 'মাজদো যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যত ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো, সবই পুরো হয়ে গেছে।' কিতাব হিযকিলের ৩৮ অধ্যায়ে বলা আছে— আল্লাহ ইসরাঈলকে বিধর্মীদের কবল থেকে উদ্ধার করলেন, যখন তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো। অতঃপর ওয়াদা করলেন পবিত্র ভূমিতে তাদেরকে মর্যাদা সহকারে বিজয় দান করবেন।

একথা সম্ভবত দুই হাজার সালের পরে পুরো হবে। ইতিহাসের এই প্রথম মাজদো যুদ্ধ ও ঈসা মসীহের (আঃ) আগমনের জন্য স্টেজ তৈরি হয়েছে। তৃতীয় সহস্রাব্দের আগমন যতই নিকটস্থ হচ্ছিলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবেগ-আগ্রহ ততোই গভীরভাবে দানা বাঁধছিলো। ঊনবিংশ শতকের শেষ কয়েক বছরে এ যুদ্ধ সম্পর্কে অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়। কোনো কোনো গ্রন্থ তো বেস্টসেলারের মর্যাদায় পাশ্চাত্যের গ্রন্থজগৎ মাত করে ফেলে। অর্জন করে আকাশ ছোয়া খ্যাতি

ও গ্রহণযোগ্যতা। এক্ষেত্রে অথ্রান লেবার্টিসের লেখা শেষ যুগের ড্রামা গ্রন্থটির কথা বলা যায়। প্রকাশ হওয়া মাত্র এর লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এরপর হাল ল্যান্ডসি লিখেন 'বিশ্বমানচিত্রের মহাপর্যটক' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের এক কোটি আশি লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এ গ্রন্থের আদলে কিছু দিনের মধ্যেই রচিত হয় আরেকটি গ্রন্থ। ফরাসী ডক্টর লারজান বির, ইংরেজ ডক্টর ডিউট, গ্রিক ডক্টর ডেমিট্রি ইসরাঈল ডক্টর মিরয়েম মিলে রচনা করেন বিশাল এক গ্রন্থ দুনিয়া সমাপ্তির রহস্য। ইঞ্জিনের ইউহান্না থেকে তারা গ্রন্থের মূল নির্যাসটুকু গ্রহণ করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখা হয়— 'আমাদের সভ্যতা একবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবিমান উড়াবে। যুদ্ধটি খুবই দীর্ঘ হবে না। কেননা বিদ্যমান আনবিক অস্ত্রের প্রয়োগ এ যুদ্ধের পরিণতি রচনা করবে। গগমেগগ তথা ইয়াজুজ-মাজুজ হবে প্রতিপক্ষ আমাদের। চীনের পৃষ্ঠপোষকতা তারা পেতে থাকবে। এদের কাছে আছে পারমানবিক অস্ত্রভান্ডার। এদের সমরশক্তি তাক করে আছে ইউরোপের দিকে।

এ গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া মাত্রই চারদিকে হুলস্থুল সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে প্রতিটি বড় ঘটনার সাথে ইউরোপ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগসূত্র টানতে শুরু করে। যাতে করে সেই যুদ্ধের গুরুত্ব, ভয়াবহতা, অনিবার্যতা ও প্রভাবের ধারণা লোকদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

তুলে দিতে শুরু হলো তৎপরতা। তারা পুরো এক ছক সাজিয়ে রাখলো। কোয়ালিশনের নেতা রবার্টসন ছক অনুযায়ী এমনভাবে সাফল্য রচনা করলেন, যা রূপকথার কাহিনীর মতো শুনায়। সেই নির্বাচনে বুশ জুনিয়র জয়ী হলেন এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার সব দায়িত্ব কন্ডোলিজা রাইস ও জেনাল্ড রামসফেল্ডকে নিয়ে কাঁধে তুলে নিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ এর ২৬শে মার্চের লস এ্যাঞ্জেলস টাইমসের তথ্য মতে পাদ্রী বিট রবার্টসন বুশকে জিতাবার জন্য ২০ কোটি ১০ লাখ ডলারের বাজেট গ্রহণ করেন। তিনি পনেরো কোটি ভোট নিশ্চিত করার লক্ষে ১৫ লক্ষ কর্মীকে ময়দানে ছেড়ে দেন। রবার্টসনের কর্মীরা সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ নির্বাচনী গাইড প্রকাশ করে। দশ লক্ষ গীর্জায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। রবার্টসনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উগ্রতার অভিযোগ উঠে। তিনি এর খণ্ডন করে বলেন— আমেরিকার অস্তিত্বের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি ফেডারেশন আগ্রহী। আমেরিকা যেসব বিষয়ের মুখোমুখি আমরা তারই প্রতি দৃষ্টপাত করতে চাই। বিশেষত চীন যখন আমেরিকার পারমানবিক গোপন তথ্য অবগত হয়ে গেছে।

এই পাদ্রী ১৯৮৬ এর নির্বাচনে নিজেই ময়দানে নামবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় এতো সুযোগ-সুবিধা তার ছিলো না। কিন্তু আবেগ ছিলো তীব্র ধর্মীয় উন্মাদনার উন্মত্ত একদল কর্মী ছিলো তার হাতে। এখন তো তার সামর্থ্যের অস্বাভাবিক উল্লম্ফন ঘটেছে। তার নিয়ন্ত্রিত টি.ভি. চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা দুই কোটি চল্লিশ লক্ষেরও অধিক। তার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ফিনান্সিয়াল সহযোগির তালিকা অনেক দীর্ঘ। তার টি.ভি. চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা টাইমস, নিউজ উইক, নিউইয়র্ক টাইমস, লস এ্যাঞ্জেলস টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টের সম্মিলিত পাঠক সংখ্যারও অধিক। খ্রিস্টিয় মৌলবাদের এই মুকুটহীন সম্রাট ইসরাঈলের ব্যাপারে অসম্ভব উৎসাহী। তার দৃষ্টিতে ইসরাঈল সেই ভূমি, যেখানে শেষ সময়ের সমস্ত ঘটনা ঘটবে। তিনি বলেন— ইসরাঈল রাষ্ট্র গঠনই আসলে একটি ঘোষণা। ঘোষণাটি হলো— দুনিয়ার সমাপ্তি লগ্ন এসে গেছে। এখন শুধু অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীর ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন।

এ্যাংলিকান ও হারমাজদো—

এ্যাংলিকানরা বাস্তবতার পূজারি ও শব্দার্থের অনুসারী। তাওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ, স্থান, সময়, সমকালীন ঘটনাবলী, ব্যক্তিবর্গের নাম, দলসমূহ, শহর, সমুদ্র, নদী, বৃক্ষ ইত্যাদির বিবরণ যেভাবে আছে, সেভাবেই বিশ্বাস করে। তাদের মতে তাওরাত-ইঞ্জিলে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অর্থে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং ঈসা মসীহের (আঃ) অনুসারীরা শত্রুদের সাথে ঘোড়া, তলওয়ার, তীর ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধ করবে। কারণ এটাই লিখা আছে তাওরাতে। তাদের বিশ্বাস হলো বিদ্যমান সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংসের দিকে চলে যাবে। এবং লোকেরা প্রাচীন জীবনপদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। খ্রিস্ট ধর্মীয় যে সব বর্ণনার সাথে ইসলামী বর্ণনার মিল পরিলক্ষিত হয়, এগুলোর সাথে ইসলামের যুগসূত্র সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় নেতারা এমন সব উক্তি করে, যাতে মনে হয় মানুষের দেহের ভিতর থেকে শয়তান কথা বলে চলছে।

আমেরিকান যায়নবাদী গ্রিস হালসেল এক এ্যাংলিকান যাজককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, পরম দয়ালু হওয়া সত্ত্বে ঈশ্বর কিভাবে সর্বশেষ পারমানবিক মহাযুদ্ধ কামনা করতে পারেন? জবাবে তিনি বললেন— ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহই মানুষকে এই সব জননিধন অস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়েছেন। অতএব এর প্রয়োগ অস্বাভাবিক কিছু নয়। আল্লাহর ইচ্ছায়ই তা সংগঠিত হবে। আন নবুওত ওয়াস সিয়াসাত, মুহাম্মদ ইসহাক লিখিত ভূমিকা)

হাল লেন্ডসি তার বই— আসন্ন নয়া পৃথিবীতে লিখেন— এই সব বাহিনীর বিষয়টি অবশ্যই ভাবনার । যে বাহিনী ২০ কোটি যোদ্ধাসহ পূর্ব দিক থেকে আসবে। তাদের সাথে যুক্ত হবে ইউরোপের লক্ষ লক্ষ সহযোগী। এদের নেতৃত্বে থাকবেন ঈসা মসীহ (আঃ)। ঈসা মসীহ (আঃ) প্রথমে তাদেরকে শেষ করবেন, যারা আল কুদসকে অপবিত্র করেছিলো। এরপর হারমাজদুয় জড়ো হওয়া শত্রুদের মেরে ফেলবেন। এরপর কী ঘটবে? বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, ঘোড়াগুলোর লাগাম হবে রক্তে রঞ্জিত। কুদস শহর থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত সমস্ত এলাকা যুদ্ধাস্ত্র, পশু আর মানুষের রক্তে ভর্তি হয়ে যাবে।' তিনি আরো লিখেন— অবস্থা এমনই হবে যে, মনে হবে সব কিছু অবিশ্বাস্য। স্বাভাবিক জ্ঞানে ধরা মুশকিল যে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে কিভাবে এতোটা হিংস্র হয়ে উঠবে। কিন্তু ঈশ্বর সেদিন মানুষের মেজাজকে এমনই অবস্থায় নিয়ে যাবেন। যাতে তারা সব কিছু ধ্বংসের নেশায় হন্যে হয়ে উঠবে।'

এ্যাংলিকান খ্রিস্টানদের মতে এটা অনিবার্য এবং এটা সংগঠিত হবে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের আলোকেই। অতএব একে মেনে নিতে হবে। আর এর হিসেবে নিজেকে সেভাবেই তৈরি করতে হবে। যে কোনো ধরনের সম্প্রীতি পরিহারযোগ্য। কারণ শত্রুদের সাথে সম্প্রীতি আল্লাহর তাকদীরকে চ্যালেঞ্জ করারই নামান্তর। এ্যাংলিকান বিশপ জিমি সোগার্ট ১৯৮৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন— আমি আশা করি বলবো যে, আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করেছি। কিন্তু আমরা জানি হারমাজদো সংগঠিত না হয়ে উপায় নেই। এটাতো আগামী দিনের অনিবার্য বাস্তবতা। সেই যুদ্ধের কেন্দ্র হবে মাজদো প্রান্তর। সেই যুদ্ধ আসছে। আর ওরা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করছে একের পর এক। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। কিছুই হবে না কালো দিবস না আসার সময় পর্যন্ত। আমি আসন্ন সেই নরকসময়ে প্রবেশের কোনো পরিকল্পনা পেশ করছি না। কিন্তু প্রভু তার মাহাত্ম্য সহকারে অবতরণ করবেন। আমরা অবশ্যই আনন্দিত যে প্রভু আসবেন দ্বিতীয়বার। সন্দেহ নেই হারমজদো যুদ্ধের কল্পনা আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করে রাখে।'

কিন্তু রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়া ও লাশে লাশে ময়দান পূর্ণ করা সেই ঘটনার মধ্যে প্রশান্তির কি আছে? তাদের মতে এই যুদ্ধে ইহুদীদের একটি অংশ ও খ্রিস্টানগণ ছাড়া সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব অন্য সবাই ধ্বংস হবে, এতে প্রশান্তি তো থাকারই কথা। এ রকম বিদ্বেষ অতীতে ছিলো ইহুদীদের মধ্যেই। এখন তা সংক্রমিত হয়েছে খ্রিস্টানদের একঅংশের মধ্যেও।

যারা দয়াময় ঈশ্বরের প্রেমের কথা বলে শান্তি ও নিরাপত্তার নামে গলাবাজী করে বাতাস ভারি করে তুলে। ইহুদীরা এতোদিন অপরাপর জাতিকে জেনটাইলস হিসেবে জানতো। এর অর্থ ইশ্বর এদেরকে দাস হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে প্রোটেস্টানরাও ইহুদীদের সেই বর্ণবাদকে গলার তাবিজ বানিয়ে ফেলেছে। তারা আজ মানবতার কবর রচিত হওয়াকে আত্মার প্রশান্তির ব্যাপার বলে প্রচার করছে। কী অবাক ব্যাপার! সকলেই তা শুনলো। কিন্তু হিম হয়ে সবাই বসে থাকলো। যেনো এই ভয়াবহ ঘোষণাটি তাদের কানে প্রবেশ করেছে মধুময় সংগীতের লহরি তুলে।

বিখ্যাত এ্যাংলিকান বিশপ হ্যারি ফ্যালওয়েল ১৯৮৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হারমজদু বিষয়ক লেকচার দানকালে বলেন— আমাদের খ্রিস্টান হওয়া কতোই মহান ব্যাপার। আমাদের সম্মুখে এক গৌরবময় ভবিষ্যত। আমরা প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞ যে এক মহাযুদ্ধ জেনটাইল সম্প্রদায়গুলোর চিরঅবসান ঘটাবে। তাদের থেকে পৃথিবী মুক্ত হলে মঞ্চে আসবেন ঈসা মসীহ (সাঃ)। আসবেন পুরো শক্তি ও মাহাত্ম সহকারে। তাঁর আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। হারমজদোর প্রতীক্ষাকারীরা শুধু এর রঙিন স্বপ্ন দেখেই মজা পাচ্ছে, তা নয়। তারা বরং স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সচেষ্ট রয়েছে। লস এ্যাঞ্জেলস টাইমস ১৯৮১ সালের ৪ মার্চ বিশপ ফ্যালওলে-এর একটি সাক্ষাতকার ছাপা হয়। তাকে পারমানবিক বিশ্বযুদ্ধের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন আমার মনে হয়, রাশিয়ার পেট্রোল সঞ্চয় এক সময় ফুরাবে। জ্বালানি সংকট তীব্র হয়ে উঠবে। সে হা করে এগিয়ে আসবে ইসরাঈল ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। তখনই জাহান্নামের দরোজা খোলে যাবে।

এই বিশপ দুই বছর পরে পারমানবিক যুদ্ধ ও মসীহর দ্বিতীয় আগমন শীর্ষক এক বই লিখেন। এতে একটি অধ্যায় ছিলো ঐ যুদ্ধ সম্পর্কে, যার সূচনা ঘটবে রাশিয়ার মাধ্যমে। ফেলওয়েলের মতে সেই যুদ্ধ হবে মধ্যপ্রাচ্যে। এতে শত্রু বাহিনীর ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে হিমকিলের ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। তিনি আরো লিখেন— এর মাধ্যমে প্রভুর আগমনের প্রাথমিক ক্ষেত্র তৈরি হবে। চূড়ান্তভাবে তাঁর আগমন নিশ্চিত হবে হারমাজদো যুদ্ধের মাধ্যমে। এখানে যে দিকটি চমকপ্রদ, তা হলো বিশেষ করে রাশিয়ার কথা আনা হয়েছে। এর কারণ হলো এ্যাংলিকানদের মতে অন্যান্য শত্রু দেশের সাথে রাশিয়ার কথাও পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হারমজদো যুদ্ধে রাশিয়া শত্রু বাহিনীর সঙ্গে থাকবে। তাওরাতের হিযকিলের ৩৮–৩৯ অধ্যায়ে রুশ কথাটার উল্লেখ আছে। যা দ্বারা আসলে রাশিয়া বুঝায়। মাশক শব্দও আছে, যা মস্কো বুঝায়। তুরাল শব্দও আছে,

যা রাশিয়ার বড় শহর টেবুলেষ্ক বুঝায়। সেখানে বিশেষ করে ফারেস শব্দটা আছে। যা ইরান বুঝায়। তাওরাতের বক্তব্য মতে হারমাজদো যুদ্ধে ইরান হবে শত্রু পক্ষের প্রধান অংশীদার। এতে উল্লেখ আছে কুমর শব্দটা, যা দ্বারা পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উদ্দেশ্য। আছে তুগারমা শব্দ যা দ্বারা ককেসাস এলাকা উদ্দেশ্য। শত্রু পক্ষের মধ্যে বিসার লোকেরাও থাকবে। এ্যাংলিকানদের মতে সেখানে বসবাসকারীরা আসলে দানব। লেবাননের কথা আছে, ইথিউপিয়ার কথা আছে, আছে সুদানের কথা, দক্ষিণ ইয়েমেনের কথাও। ইরাকের কথা তাওরাতে এসেছে বড় ক্রোধের সাথে ঘৃণার সাথে এবং বিদ্বেষ সহকারে। ইরাকের উল্লেখ হয়েছে আশুর এবং বাবেল নামে।

ইসরাঈলের উল্লেখ কিন্তু তাওরাতে ইসরাঈল নামেই। ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠাতারা তাওরাতের নামকেই নির্ধারণে ভুল করেননি। তাওরাত মতে বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রীয় ঘটনাবলী ইসরাঈলকে ঘিরেই ঘটতে থাকবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হবার আশঙ্কা ধূমায়িত হচ্ছে বিশ্বজোড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও আধিপত্যবাদ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকৌশলের আড়ালে। এ কৌশলের প্রতিক্রিয়া এমন এক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, যেখান থেকে ফিরে আসা এক কথায় অসম্ভব। চল্লিশের দশকে আমেরিকা পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর ব্যবহারও ঘটিয়েছে হিরোসীমা নাগাসাকীতে। সেখানে ঘটিয়েছে মানবতার সর্বনাশ। এরপর থেকে দুনিয়া জুড়া পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগীতায় আমেরিকা সবার সম্মুখে। আল্লাহই জানেন, এই প্রতিযোগিতার শেষ গন্তব্য কোথায়। উইলিয়াম আরকন ও রুটসলড ফিল্ডের লেখা 'পারমানবিক যুদ্ধের ময়দান' শীর্ষক বইয়ে লিখা হয়েছে— আশির দশকের শুরুতেই আমেরিকার হাতে ৬৭০টি পারমানবিক সমরোপকরণ ছিলো। বর্তমানে (নব্বইয়ের প্রথম দিকে) আমেরিকার তৈরি পারমানবিক অস্ত্র চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত। এ ছাড়া বহু পারমানবিক কেন্দ্র রয়েছে। জার্মানীতে রয়েছে আমেরিকায় ৩৩৯৬টি ব্যাপক জনধিধ অস্ত্র বৃটেন ১২ হাজার ৬৮টি, ইতালিতে আছে ৫৪৯টি, তুরস্কে আছে ৪৮টি, গ্রিসে আছে ১৬৪টি, দক্ষিণ কোরিয়ায় আছে, ১৫১টি, হল্যান্ডে আছে ৮১টি, বেলজিয়ামে আছে ৬৫টি আমেরিকান মারণাস্ত্র। সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্লার্ক ক্লেফোর্ডের মতে এই সব পারমানবিক অস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতার সম্মিলিত মাত্রা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি। এরপরও ক্লেফোর্ড নিজেকে প্রশ্ন করেন- আমেরিকার কী করা উচিত? নিজেই উত্তর দেন— আরোও আণবিক অস্ত্র বৃদ্ধি।

আরো চাই, আরো চাই ঃ

ধ্বংসই যখন গন্তব্য হয়, সর্বনাশের দিকেই যখন দৌড় শুরু হয়, তখন শান্তির উপকরণ খোজা হয় যুদ্ধের বাহন। মরণাস্ত্রের মধ্যেই তালাশ করা হয় জীবনীশক্তি। এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নিরাপত্তার গোপন প্রাণ! বৃহৎ শক্তিগুলো এক ধ্বংসোন্মাদনার রাজপথ ধরে দৌড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই চাচ্ছে সেই শক্তি হাতে আসুক যে শক্তি ধ্বংস করেছিলো হিরোসিমা-নাগাসাকীর জীবনযাত্রা। এই উন্মাদনার মধ্যে লুকিয়ে আছে হারমাজদো। সেই যেনো বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে মরণাস্ত্রের বাজার গরম করে তুলেছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোও এখন মৃত্যুর হাতিয়ার সংগ্রহের নেশায় আত্মহারা।

ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান তো এক্ষেত্রে সামনের সারিতে রয়েছে। আমরা আজ এমন এক সময়ে উপস্থিত, যখন সরকারগুলো জনগণের রিজিক থেকে ছিনিয়ে নেয়া অর্থে ধ্বংসের উপকরণ দিয়ে ভর্তি করছে অস্ত্রাগার। যারা এতে ব্যর্থ হচ্ছে, তারা যেনো আরো বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছে কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল অস্ত্র খেয়ে নিজেই নিজের ধ্বংস নিশ্চিত করার জন্য। গরীবরা আর যাই হোক, অন্তত ব্যালাস্টিক মিসাইলের অধিকারী হতে চায়। এগুলোকেই পরিণতিতে আণবিক শক্তি দ্বারা চালনা করা যাবে। এক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়া, ইরান কিংবা পাকিস্তানের নাম আনা যায়। ১৯৯৮ সালে শাহাব-৩ এর পরীক্ষা চালালো ইরান। উত্তর কোরিয়া চালালো তাইপোদং মিসাইলের পরীক্ষা। পাকিস্তান গোরির পরীক্ষা করলো, ইন্ডিয়া করলো অগ্নির পরীক্ষা।

আমেরিকায় হারমজদো স্মাগলিং নামে একটি বই বেরিয়েছে। রিয়োনসেলারলি এ বইটির লিখক। এতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমানবিক স্মাগলিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছেন। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন ড্রাগ, হিরোইন ও যুদ্ধাস্ত্রের বিভিন্ন চালানের সাথে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক স্মাগলিংও চলছে খুব সহজেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার সময় বিভিন্ন ছোটখাট পারমানবিক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে; এক্ষেত্রে বিভিন্ন সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিলো। যাদের তৎপরতা ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। এই সব সিন্ডিকেটের প্রতি হাত বাড়ায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও। তারা চেষ্টা করছিলো যে কোন ফাঁকে ধ্বংসাত্মক শক্তিতে বলিষ্ঠ হয়ে উঠা যায় কিনা!

তাহলে কী বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে ক্ষুদ্র দেশগুলোও সর্বনাশের প্রস্তুতিতে হন্যে হয়ে উঠলো? এই আশংকাটি আলোচ্য বিষয় নয় আজকের পৃথিবীতে।

প্রাচ্যপাশ্চাত্যের পারমানবিক রণসজ্জা সেই মহাযুদ্ধের ত্বরান্বিত বরং সংঘটিত হবারই লক্ষণ। ইউরোপ-আমেরিকায় এ ধারণাই ছড়িয়ে পড়েছে। আসল কথা হলো বিশ্বব্যাপী এই অস্ত্র প্রতিযোগিতাও ধ্বংসের প্রস্তুতির গোড়ায় আছে ইহুদীরা। কেননা তাদের হাত দিয়েই আমেরিকায় এর সূচনা ঘটেছে। ইসরাঈল তিন শোর অধিক পারমানবিক বোমা তৈরি করেছে। অথচ শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলোকে গোরস্তানে পরিণত করার জন্য দশটি বোমাই যথেষ্ট। ইসরাঈল মধ্যপ্রাচ্যের মাথার উপর পারমানবিক রণসজ্জার ডংকা বাজাচ্ছে। কিন্তু তার পাহারাদার আমেরিকা সবাইকে বলে দিয়েছে– তোমরা কেউই কিন্তু আণবিক অস্ত্র সংগ্রহের কল্পনাও করতে পারবে না। সেটা হবে গুরুতর অপরাধ।

ইহুদীরা খ্রিস্টানদের মতো হারমাজদো নিয়ে যদিও এতাটা চিল্লাচিল্লি করছে না, কিন্তু হারমাজদো নিয়ে তারাও অসম্ভব উৎসাহী।

হারমাজদোর জন্য তারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত। কিছুদিন আগে খবর এসেছে হারমাজদোর নিকটবর্তী হাইফাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী সামরিক ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আয়তনে ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্রটি ইউরোপ-আমেরিকার আঁচলতলে বরাবরই আশ্রয় খোঁজে নিয়েছে। সে সর্বক্ষণই আরবদের মোকাবেলায় যাতে না হারে, এ সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত। এক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্রের পাহাড় গড়ে তোলাটাই মোক্ষম অবলম্বন। ইসরাঈল তাই করছে। তাকে সহযোগিতা করছে খ্রিস্টান দুনিয়া। মুসলিম বিশ্ব তাদের আণবিক নলের মুখে রয়েছে। এমতাবস্থায় এসেছে তৃতীয় সহস্রাব্দ। একটি পারমাণবিক মহাযুদ্ধের সাথে জড়িত নানান স্বপ্নের ঘোরের ভিতর কাল কাটাচ্ছে ইহুদী- খ্রিস্টানরা। তাদের হৃদয়ে ক্রোধ, হাতে ধ্বংসের হাতিয়ার। যুদ্ধের জ্বলন্ত ইস্যু অনেকটাই। ইসরাঈল নিজেই এক উত্তাল ইস্যু। যে কোন ইস্যুতে বেঁধে যেতে পারে যুদ্ধ। উগ্র ইহুদী খ্রিস্টানরা একে চাইবে হারমাজদোর দিকে নিয়ে যেতে। কেননা হারমাজদোর যুদ্ধোপকরণ তাদের হাতে হাতে। তারা যখনই কোনো শত্রুর ছায়া কল্পনা করে, সাথেসাথে অলক্ষ্যেই তাদের হাত চলে যায় পারমানবিক বোমার স্ট্রিগারে। এমতাবস্থায় যে কোন কারণে যদি কখনো পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটে যায়, তাহলে কী হবে? পৃথিবী কী পরিণত হবে না মৃত্যুময় এক গ্রহে?

১৯৬৮ সালের আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় এরই হুমকি আরবদের শুনিয়েছিলো আমেরিকা। এরপর ইরাক যখন তেল আবিবে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করলো, তখন পৃথিবী শুনেছিলো এই হুমকিরই পুনরাবৃত্তি। ইহুদীদের পক্ষে আমেরিকার সেই হুমকি আজো জ্বাজ্জল্যমান। কিন্তু পারমানবিক শক্তির বৃহৎ ভাণ্ডার গড়ে ইসরাঈল নিজেই একন শান্তিকামী মানবতার মাথার উপর হুমকির ছড়ি ঘোরাচ্ছে।

ইহুদীবাদী কালো থাবার মুখে মসজিদে-আকসা

মসজিদে-আকসা ভেঙ্গে ফেলার সিদ্ধান্ত ইহুদীরা নিয়ে রেখেছে। তৃতীয় সহস্রাব্দ যতই নিকটে আসছিলো, তাদের জোশ বেড়েই চলছিলো। ইউরোপ-আমেরিকার এ্যাংলিকান খ্রিস্টানরা দুহাত ঢেলে তাদের সহযোগিতা করছে। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তালপাতার সেপাই। নিজেরা পান থেকে চুন খসা নিয়ে মেতে আছে ঝগড়া-ঝাটিতে। এমতাবস্থায় বায়তুল-মোকাদ্দাস বড়ই সঙ্কটে পড়েছে।

সন্দেহ নেই এই মসজিদ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর নিকট কেন্দ্রীয় মসজিদের গুরুত্ব রাখে। মধ্যপ্রাচ্যে একে ঘিরেই রাজনীতি ও যুদ্ধনীতির ঘুরপাক চলছে। একে কেন্দ্র করে ঘনীভূত সংকট এখন আর আগের অবস্থায় নেই। তা বরং দিন যতো যাচ্ছে, একটি বিস্ফোরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিস্ফোরণ শুধু ফিলিস্তিন ও এর আশপাশের আধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং দুনিয়ার সোয়া শো কোটি মুসলমান ও ততোধিক সংখ্যক খ্রিস্টানের মধ্যে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সুনিশ্চিত। সেই প্রভাব সহিংস হয়ে উঠলে পৃথিবীতে প্রলয় সৃষ্টি হবে। প্রলয়ের এই আশংকার কথা বাড়িয়ে বলছি না। বিদ্যমান পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তার প্রতি খেয়াল করলেই স্পষ্ট হবে— আশংকাটি নিছক আশংকা, না জ্বলন্ত বাস্তবতা এক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্যণীয়।

এক নম্বর বিষয় হলো, সারা দুনিয়ার ইহুদীরা অধীর আগ্রহ নিয়ে মসজিদে আকসাকে গুড়িয়ে দেয়ার 'সুসময়ের' প্রতীক্ষা করছে। যায়নবাদী আন্দোলনের নাড়ির খবর যারা রাখেন, এ বিষয়টি তাদের অজানা নয়। তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা, এবং আল-কুদস ও ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তাদের আকীদাগুলো পরিষ্কার সংগ্রহিত। তাদের দৃষ্টিতে তৃতীয় সহস্রাব্দ আগমনের ঘটনা ঘটলে বাকি দুই ঘটনা অনিবার্য। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আল্লাহ তাদের সাথে একটি অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তৃতীয় সহস্রাব্দে ইহুদীদের দেবেন বিশ্ব নেতৃত্ব ও প্রশ্নাতীত ক্ষমতা। তাদের হাতে যে তাওরাত আছে, এর ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

তবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার বাস্তবায়ন তখনই ঘটবে, যখন ইহুদীদের কিবলা হাইকলে সোলেমানী পূনঃনির্মিত হবে। এটাই হচ্ছে সমস্ত ইসরাঈলী পয়গাম্বরদের কেন্দ্রস্থল এবং এখনও যে মসীহের প্রতীক্ষায় তারা প্রহর গুণছে, সেই নবীরও কর্ম-কেন্দ্র হবে আল-কুদস। ইহুদীদের বিশ্বাস হলো, যত দ্রুত সেই হাইকল নির্মিত হবে, ততই দ্রুত সেই নবীর আগমন ঘটবে। তাদের মতে

যেখানটায় মসজিদে-আকসা ও কুব্বাতুস-সাখরা রয়েছে, সেটাই হাইকলের জায়গা। অনুরূপ বিশ্বাস খ্রিস্টানরাও পোষণ করে। বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রচারণার ফলে লক্ষ লক্ষ খৃস্টানের মধ্যে এ আকিদা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ঈসা (আঃ)-র আগমন তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতেই ঘটবে। হাইকলে সোলেমানীই হবে তার কেন্দ্রবিন্দু। তাদের কাছে যে ইঞ্জিল আছে, সেখানে এ বক্তব্যের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। বায়তুল-মোকাদ্দাস ভেঙে হাইকল বানাতে গেলে মুসলমানদের প্রতিরোধ অনিবার্য। তাদের প্রথম কিবলাকে ভেঙ্গে চুরে গুড়িয়ে দেয়া হবে, এ তারা সইতে পারবে না। এমতাবস্থায় ইহুদী-খ্রিস্টান বনাম মুসলমানের মধ্যে ভয়ানক এক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। ইহুদীরা অন্তত এ ব্যাপারে সচেতন যে এরকম একটি যুদ্ধ বেধে গেলে তা আর থামবার নয়। দাবানলের মতো তা ছড়াতে থাকবে দুনিয়ার এদিক ওদিকে।

উগ্র ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দেমাগে যে বিপর্যয়কর চিন্তার বসবাস রয়েছে তার বাস্তব রূপায়নে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা হাইকল বানাবেই বানাবে। এ জন্য নানা প্রকল্প তারা হাতে নিয়েছে। যে সব প্রকল্প সাম্প্রতিক পৃথিবীতে বিভিন্ন ট্রাজেডিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলছে। আসলে ইসরাঈল রাষ্ট্রটাই জ্বলন্ত এক ট্রাজেডি। এক সময় ইহুদীরা আল-কুদসকে রাজধানী করার স্বপ্নই শুধু দেখতো। আজ তা বাস্তব। সামনে তাদের যে লক্ষ্য রয়েছে একেও পূর্ণ করার জন্য সব ধরনের শক্তি-সামর্থ্যে তারা পরিপুষ্ট হয়ে চলছে। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব প্রকল্পের গর্ত তারা খুড়ছে, মুসলমানরা উন্মাদের মতো সেই গর্তের দিকে ছুটছে। কে কার আগে ঝাঁপ দেবে, এই প্রতিযোগীতা যেনো চলছে।

ইহুদী নিয়ন্ত্রণে আল-কুদস

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কিবলা থাকে। ইহুদীদের ধারণা অনুযায়ী হাইকলে সোলেমানী হলো তাদের কিবলা। ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এই ইবাদতগাহ তৈরি করেছিলেন এবং সোলাইমান (আঃ) এর হাতে এর নবায়ন ও পূর্ণতা অর্জিত হয়। অপরদিকে মসজিদে আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা। এর সাথে ধর্মীয় ও জাতিগত সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধন রয়েছে ইব্রাহীম (আঃ) এর নির্মিত কাঠামোর উপর হযরত সোলাইমানের (আঃ) সংস্কার ও পূর্ণতা সাধনের পর এ মসজিদের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে যায়। ফলে হাইকলটি তার আসল আকৃতি হারাতে থাকে।

মুসলমানরা যখন জেরুযালেম জয় করলেন তখন হাইকলের কাঠামো বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। হাইকলের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য একটি মাত্র ভাঙাচুরা দেয়ালই শুধু ছিলো। কেননা খৃস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে বাবেল সম্রাট বুখতে নসর একে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলো। তারপর ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমান বিজেতা টিটস একে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের দেয়ালটা অবশিষ্ট ছিলো। ইসরা ও মেরাজের রাতে হুজুর (সাঃ) এর বাহন বোরাককে এখানেই বেঁধে রাখা হয়েছিলো। এটা হচ্ছে সেই দেয়াল, যাকে ইহুদীরা বিষাপের দেয়াল বলতো। (মসিজিদে আকসার উপর এই দুই ধ্বংসযজ্ঞের কথা কোরআন শরীফে সূরা ইসরায় উল্লেখিত আছে।) হুজুর (সাঃ)-এর আগমন পর্যন্ত এই দেয়ালটাই অবশিষ্ট ছিলো। হাইকল না থাকলেও ইহুদীরা গীরিয়া দেয়ালকে কিবলা হিসেবে মানে এবং প্রচন্ড আগ্রহে সেই দিনটির অপেক্ষায় তারা আছে যে দিন হাইকল পূনঃনির্মিত হবে। স্বপ্নের সেই নির্মাণকে ইহুদীরা তৃতীয় হাইকল বলে অভিহিত করে।

খ্রিষ্টানদের কাছেও এই হাইকল পবিত্র। তারাও এর দিকে রুখ করে ইবাদত করে। তবে হাইকল নির্মাণের যুদ্ধে ইহুদীদেরকে তারা সম্মুখে দেখতে চায়। কেননা হাইকল নির্মিত হবে তো যিশুখ্রিস্ট আসবেন। যিশুখ্রিস্ট আসবেন তো ইহুদীরা হেদায়েত পাবে। যিশুখ্রিষ্টের হাতে হাত রেখে ইহুদীরা খ্রিস্টান হবার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এতো বড়ো সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে ইহুদীদের উচিত হাইকল নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখা। প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের মধ্যে এই আকিদা খুবই পোক্ত। ইহুদীদের সাথে তাদের গলায় গলায় ভাব। ধর্মীয় অনেক আকিদায় ও তাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান।

ইহুদীরা এ বিষয়ে সচেতন যে, হাইকল নির্মাণের কাজটি তাদেরই। বিগত দুই হাজার বছর অপেক্ষা করেও কাজটি করার সুযোগ তারা পায়নি। গেলো শতাব্দীতে ফিলিস্তিন কব্জা করার পর থেকে স্বপ্ন পূরণের মৌসুম এসে যায়। ১৯৬৭ এর যুদ্ধের পর থেকে কুদস শহর তাদেরই করায়ত্তে। বায়তুল-মোকাদ্দাসে তারা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রেখেছে। কিন্তু মসজিদটি ভেঙে ফেলার সাহস তাদের হচ্ছেনা। তবে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য একের পর এক কৌশল প্রণয়ন চলছেই আর চলছে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা।

ইহুদীরা শহীদ করবে মসজিদে-আকসাকে ?

কোরআন-হাদীসে এমন কোনো বক্তব্য নেই, যাতে বুঝা যায় মসজিদে আকসা ভেঙে ফেলা অসম্ভব। এটি ঘটবার জন্য ফিতনা বিষয়ক হাদীসে এর আলোচনা

থাকতে হবে, তা জরুরী নয়। কতো বড়ো বড়ো ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে গেলো কোরআন-হাদীসে এসবের উল্লেখ নেই। ভবিষ্যতের প্রত্যেক বড় ঘটনার সংবাদ দিতে হবে, এটি কোরআন-হাদীসের কাজও নয়।

মসজিদে আকসা ভেঙে ফেলা কেন অসম্ভব হবে ? কাবা ঘর কী শহীদ হয়নি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামানায়। অথচ তার উল্লেখ তো কোরআন-হাদীসে নেই। বাতেনী চরমপন্থীরা হাজরে-আসওয়াদ ছিনিয়ে নিলো। একে তারা নিয়ে গেলো বাহরাইনে। সেখানে কয়েক বছর পাথরটি থাকলো তাদের হাতে। কই ? এর উল্লেখ তো কোরআন-হাদীসে নেই। অতএব কোরআন-হাদীসে অমুক জিনিসের উল্লেখ নেই অতএব তা ঘটা অসম্ভব, এমন ফতোয়া কারো দেয়া উচিত নয়। দুনিয়ার স্বাভাবিকতায় কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়া উপায়-উপকরণের সাথে সম্পর্কিত। এটা থাকলে স্বাভাবিকভাবে ব্যাপারটা অস্তিত্বে আসতেই পারে, কোরআন-হাদীসে এর উল্লেখ থাকুক বা নাই থাকুক। আসল প্রশ্ন হলো মসজিদকে যারা শহীদ করতে চায়, তাদের প্রস্তুতি ও উপায়-উপকরণ কতটুকু ? আর মসজিদকে যারা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের প্রস্তুতিও উপায়-উপকরণ কতটুকু ?

বাস্তব পরিস্থিতিও ঘটনাচক্রের পর্যবেক্ষণে এ সাক্ষ্যই পাওয়া যায়, যে ইহুদী খ্রিস্টানরা বিগত শতাব্দীতে যে ধারাবাহিকতা সহকারে উপায়-উপকরণ আয়ত্তে এনেছে এবং যেভাবে আট-ঘাট বেধে এগুচ্ছে, এর শতভাগের এক ভাগ প্রস্তুতিও মুসলমান রাজা-বাদশাদের মধ্যে নেই।

কী ঘটবে মসজিদে-আকসা শহীদ হয়ে গেলে ?

আল্লাহ না করুক এই ঘটনা যদি ঘটেই যায়, তাহলে বহু লোকের ঈমান পরীক্ষায় পড়ে যাবে। তারা বলবে, এ আবার কেমন কথা যে মসজিদের আলোচনা আছে কোরআনে, যে মসজিদের ফযীলত বিশুদ্ধ হাদীসে হয়েছে বর্ণিত ঃ ইহুদীরা একে নিজেদের উপাসনালয় বানিয়ে নিলো!

এই লোকদের এটা কে বুঝাবে যে— ইতিহাসে এমন সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে যখন এই মসজিদের উপর খ্রিস্টানদের ক্রোশ অঙ্কিত পতাকা উড়তো। মসজিদে ঝুলতো খ্রিস্টানদের হুলিকাষ্ট। তখনও কিন্তু এই মসজিদের ধর্মীয় মর্যাদা অবশিষ্ট ছিলো। ক্রুসেডাররা এ মসজিদকে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছিলো। সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ) এর হাত দিয়ে এ মসজিদ পুনরায় তাওহীদের চর্চাকেন্দ্র হয়ে উঠে। ক্রুসেডাররা মসজিদের দেয়ালের রঙ বদলে দিয়েছিলো কিন্তু দেয়াল তো মসজিদ নয়। মসজিদ মসজিদের মর্যাদা নিয়েই ছিলো। তখনও কেউ

বায়তুল-মোকাদ্দাসে নামাজ পড়লে হাদীসে বর্ণিত সওয়াবই তার জন্যে নির্ধারিত ছিলো।

বায়তুল-মুকাদ্দাসের যে কাঠামো বর্তমান এর নির্মাণের সূচনা হয় ওমর (রাঃ)-এর মাধ্যমে। এর আগে এখানে টাইটসের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হাইকলের একটিমাত্র দেয়ালই অবশিষ্ট ছিলো। ওমর (রাঃ) দেয়ালটি অক্ষত রেখে সেখানে মসজিদ বানানোর হুকুম দিলেন। মসজিদ তৈরি হলো। তারপর যখন উমাইয়্যা খলীফা আব্দুল মালিকের জামানা এলো, তখন পুরনো কাঠামোর উপর রাজকীয় অট্টালিকা নির্মাণ করা হলো। যা এখনো বিদ্যমান।

হাদীসে অবশ্য একথা আছে যে দাজ্জাল চারটি জায়গায় প্রবেশ করতে পারবেনা। ১. মসজিদে-হারাম ২. মসজিদে-নববীশরীফ ৩. মসজিদে-আকসা ৪. তুর অঞ্চল। এ থেকে বুঝা যায়, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ সুরক্ষিত থাকবে। যদি ঘটনাক্রমে তা শহীদ হয়ে যায়, তবুও মুসলমানদের হাতে তা পুনঃনির্মিত হবে। অথবা হয়তো হাদীসে বর্ণিত মসজিদ দ্বারা এর আশপাশ এলাকা উদ্দেশ্য।

কীভাবে ভাঙা হবে আল-আকসা ?

একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মসজিদ ভাঙার দায়িত্ব ইহুদীরা নিজ কাধে তুলে নিয়েছে, তারা চায় হাইকলে সোলেমানী তৈরি করতে। সাথে সাথে এর সৃষ্টি হওয়া সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে সামলাবার প্রস্তুতিও তারা নিচ্ছে। দখলিকৃত ফিলিস্তিনে একশো বিশের অধিক ইহুদী সংগঠন আছে, যাদেরকে খোদ ইহুদীরা চরমপন্থী বলে অভিহিত করে। এর মধ্যে ২৫টি সংগঠনের একমাত্র শ্লোগান হলো মসজিদে আকসা ভেঙে হাইকল বানাও। এই সংগঠনগুলোর বৃহত্তর ইউনিয়ন ও ফেডারেশন রয়েছে যার মধ্যে একটি হচ্ছে আল-কুদস লীগ। এই লীগের অধিনে আছে অনেকগুলো উগ্রবাদী ইহুদী সংস্থা। এইসব সংস্থার চাপ ও তাপে ইসরাঈল সরকার ১৯৯৬ সালে মসজিদে আকসার নিচ দিয়ে সুড়ং তৈরি করে। এই সব সংগঠন ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত চল্লিশের অধিকবার মসজিদে আকসাকে শহীদ করতে উদ্যত হয়েছে। মাদ্রিদ ও অসলো চুক্তির পর থেকে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে।

আন্তর্জাতিক ও ইসরাঈলী মিডিয়ায় এই সব ইহুদীর ধ্বংসাত্মক তৎপরতার রিপোর্ট চাপা হতে লাগলো। বৃটেনের ফরেন রিপোর্ট ম্যাগাজিন ১৯৯৮ এর সেপ্টেম্বরের পয়লা সপ্তায় লিখেছিলো—

শাবাক তথা ইসরাঈলী পুলিশের হাতে মসজিদে আকসায় হামলার জন্যে প্রস্তুত উগ্র ইহুদীদের তালিকা রয়েছে। মাআরিফ নামে এক ইসরাঈলী জার্নালে ১৯৯৮ এর ৩০ আগস্টে মসজিদে-আকসাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়ার আশংকা প্রতিরোধে জরুরী বৈঠক শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রের উধ্বর্তন দায়িত্বশীলদের জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যাতে উগ্র ইহুদী ও ফিলিস্তিনী মুসলমানদের মধ্যে মসজিদে আকসার ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের আশংকা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, এ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বলা হয় এ রকম সংঘর্ষ হয়ে গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মসজিদে-আকসা ভাঙার এই উন্মাদনায় কেবল ইহুদী নয় বরং খ্রিস্টিয় মৌলবাদীদের অনেক গোষ্ঠীও সক্রিয়। ইসরাঈলের ইদিউত আহরনেত পত্রিকায় ১৯৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় রিপোর্ট ছাপা হয় ইসরাঈল পুলিশ দুই খ্রিস্টানকে গ্রেফতার করেছে। এরা তৃতীয় সহস্রাব্দ আগমনের পূর্বে মহান এক ধর্মীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পুরনো শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। আল হায়াত পত্রিকা ১৯৯৮ এর ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখা হয় নতুন সহস্রাব্দ আসার পূর্বে ইহুদী ও উগ্রবাদী খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে মসজিদে-আকসা ভেঙে ফেলার হুমকি সম্পর্কে মন্ত্রীসভায় আলোচনা হয়। কুদস শহরের এস এস পি ইয়ায়ের মুতসেহার বক্তব্য হলো— এক খ্রিস্টিয় গোষ্ঠীর কিছু সদস্য নিজেদের দেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে ছদ্মবেশে ইসরাঈলে প্রবেশ করেছে। তারা এদেশে এসেছে উগ্রবাদী নেতা জস্ট মিলারের গোপন নির্দেশে। মিলার কয়েক দিনের মধ্যে ইসরাঈল সফর করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইসরাঈলী পুলিশের একটি বিশেষ ফোর্স তাদের গতিবিধি অনুসরণ করছে। যাতে তারা উগ্র ইহুদীদের সাথে মিলিত হয়ে মসজিদে আকসায় হামলা না করতে পারে।

ইসরাঈলী ম্যাগাজিন মাসারিকে ২৯ আগষ্ট ১৯৯৮ এ লিখা হয়, উগ্রবাদী সংগঠনগুলোর তৎপরতা নিরাপত্তা বাহিনীর ধারণার চেয়ে বেশি নয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায়, উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোপন সংযোগ ও সংঘবদ্ধ তৎপরতা বিদ্যমান। নিরাপত্তা বাহিনীর কঠিন দায়িত্বটি হলো এদের প্রকৃত তথ্যগুলো অবহিত হওয়া। কারণ এই গোষ্ঠীগুলো ধর্মীয় চিন্তাধারায় খুবই হঠকারি খুবই মারমুখী। এদের মধ্যে সমন্বয় এতোই বেশি যে সংগঠনগুলোর মধ্যে পার্থক্য বুঝাই মুশকিল ইসরাঈল সরকারের ইচ্ছে হলো এরা যেনো উপযুক্ত সময়ের দিকে অগ্রসর হয়। এবং হাইকল ইস্যুতে যথাযথভাবে শক্তির ব্যবহার করে। যাতে সরকারকে রাজনৈতিক জটিলতায় পড়তে না হয়। আগস্ট ১৯৯৮ এ মাআরিফ পত্রিকায়

হুমকিও আশংকার তিন দিক শিরোনামে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যাতে লিখা হয়, পবিত্র মসজিদ ধ্বংসের কাজ তিন পদ্ধতির যে কোন একটিতে হবে। প্রথমত মসজিদ ধ্বংসের জন্য গণস্থলে উগ্রবাদী প্রস্তুতি। এজন্যে উগ্রবাদী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করবে। এদের মধ্যে থাকবে হাজার হাজার ধ্বংসপন্থী-কর্মী। তারা বিপর্যয়কর বহু কান্ড ঘটাবে। রবিনকে হত্যা করে আমের যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলো ইহুদীবাদী কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে এর অনুসরণ করবে। গুপ্ত হত্যা বেড়ে যাবে কখনো কখনো তা ব্যাপক গণহত্যায় রূপ নিতে পারে। কোনো কোনো চক্র বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইবে।

ইদেউত আহরনেত ১৯৯৮ সালে পহেলা নভেম্বর সংখ্যায়— ইহুদী উন্মাদ মসজিদে আকসাকে বোমা মেরে উড়াবে ? শীর্ষক এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। এতে লিখা হয়— ইসরাঈল পুলিশ ইন্সপেক্টর জেকোর আশংকা মতে ডানপন্থীদের প্রান্তিক কোনো গোষ্ঠী মসজিদে-আকসা ও কুব্বাতুস-সাখরায় বোমা হামলা করে শান্তি প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে দিতে পারে। এ হামলার বিষয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বৈঠক আহবান করেন। বৈঠকে আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, আল-কুদসের মেয়র ও এস,এসপি প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যদি মসজিদে আকসা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে জাহান্নামের দরজা খুলে যাবে।

তৃতীয় আরেকটি আশংকা আমার মনে উকি দিচ্ছে। সেটা হলো ইহুদীরা মসজিদে আকসার বুনিয়াদকে দুর্বল করতে থাকবে। এবং তার নিচের ভূমিতে গর্ত করে করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে যে, যে কোন হালকা ভূমিকম্পের ফলে মসজিদটি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। অত্যাধুনিক যন্ত্র প্রয়োগের দ্বারাও সেটা সহজেই সম্পন্ন করা যায়। মসজিদ বিধ্বস্ত হলেই হাইকলে সোলেমানী তৈরির কাজ শুরু হবে। মসজিদে-আকসা ভেঙে ফেলার উগ্রবাদী তোড়জোড় দেখে একথা মনে করার কারণ নেই যে হুকুমটি নিছক উগ্রবাদীদের পক্ষ থেকে। বরং মসজিদ ভেঙে ফেলায় সরকারও বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে বেনগুরিন অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন বেগিনও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন বহুবার। তিনি বলেছেন –আল-কুদস ছাড়া ইসরাঈলের কোনোই গুরুত্ব নেই। আর হাইকল ছাড়া আল-কুদস মূল্যহীন। ইহুদী ধর্মনেতা মকফরের বক্তব্য হলো— যে বিল্ডিংটাকে আমরা মসজিদে-আকসা হিসেবে দেখছি, সেখানেই সোলাইমান (আঃ) ইহুদীদের উপাসনাগার নির্মাণ করেছিলেন। সোলাইমান (আঃ) আর সেই ইবাদতখানা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনোই বিকল্প নেই। এ জন্য আমাদেরকে আল-আকসার বর্তমান মসজিদ ভেঙে ফেলতে হবে।

বেঞ্জামিন শেনইয়াহুরের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কুদস শহরে হাইকলে সোলেমানি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সপ্তম বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক ছিলো দশটি ইহুদীবাদী সংগঠন। ১৯৯৮ সালের ১৭ই নভেম্বরের সেই কনফারেন্সে হাজার হাজার উগ্রবাদী ইহুদী জমায়েত হয়। এই সব ইহুদী এমন সব সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত যারা কোনোভাবেই সময়ক্ষেপণ না করে যে কোনো উপায়ে মসজিদে-আকসা ভেঙে ফেলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদ্যোক্তাদের ধারণা অনুযায়ী সেখানে সাত হাজার যায়নবাদী জড়ো হয়োছিলো। এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিলো হাইকলের পুনর্গঠনির্মাণে নিজেদের মধ্যে দায়-দায়িত্ব বণ্টন। এতে অংশগ্রহণ করেন ইসরাঈলের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মুশি বেলা। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আপনারা হাইকল নির্মাণের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইসরাঈলের প্রতিটি শিশু ও যুবককে অবহিত করুন। তাদের মধ্যে জাগ্রত করুন হাইকলের আকাঙ্ক্ষা। নিজেদের ধর্মীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার পাশা-পাশি হাইকল প্রতিষ্ঠার দিকটিকেও শিক্ষার প্রতিটি স্তরে অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি। তিনি বলেন হাইকল ইহুদীদের হৃদয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু।

এরপর দাঁড়ালেন কায়েম ওহী ১২ নামক সংগঠনের প্রধান। তিনি বললেন— বন্ধুগণ! কথার উপর কথামালা বহু হয়েছে। এবার হাইকলের বাস্তবায়ন চাই। এ জন্যে নিজের জীবনকে বাজী রাখতে পারলেই হয়। অনুষ্ঠান আর বক্তৃতা দিয়ে হাইকল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এ প্রজন্মের উপর ফরজ হলো অপবিত্র কাঠামো ভেঙে চুরে হাইকলকে আজাদ করা। সেখানে ইহুদীদের পতাকা উড়বে। কোনো মসজিদ থাকবে না কোনো কুব্বা থাকবে না।

তারপর আরেক ইহুদী নেতার বক্তব্য— আমরা সরকারের নানান সীমাবদ্ধতা বুঝি। সরকার শুধু বক্তব্য ও প্রচারণার মাধ্যমে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেনা। আমরা চাই সরকার সামনে থাকুক। হাইকল প্রতিষ্ঠার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করুক। (আখবারুল-হায়াত ১৯/০৯/১৯৯৮)

ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ইসরাঈল সরকার

এতো গেলো উগ্রবাদী ইহুদী গোষ্ঠীগুলোর কথা। ইহুদীবাদী রাষ্ট্রও তো এ ব্যাপারে কম যায়না। ইসরাঈল রাষ্ট্রের পতাকা ছয় কৌনিক তারকা বিশিষ্ট। যা হাইকলের ঐতিহ্যবাহী পতাকার সেই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের বাস্তব রূপায়নে ইসরাঈল সরকার বৃহৎ ও বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। ইসরাঈলের কাছে প্রথমত অগ্রাধিকার পাচ্ছে মসজিদকে শহীদ করার বিষয়টি অতঃপর চটজলদি হাইকল বানিয়ে ফেলা। এজন্যে ইসরাঈল সরকার বহুদূর এগিয়ে গেছে।

১. মসজিদ-আকসার তলদেশ খনন ঃ এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় দশটি পর্যায়ে। অগ্রগতি সূচিত হয় ১৯৬৮ সালে। সমাপ্ত হয় ১৯৮০ সালে। তবে মসজিদে আকসার নিচে খনন কাজ এখনও অব্যাহত আছে। এর লক্ষ্য হলো মসজিদের নিচে মাটি বলতে কিছুই যাতে না থাকে। ফলে মসজিদটি ঝুলে থাকবে শূণ্যের উপর এতে প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা অথবা কারিগরী সহায়তায় মসজিদ সহজেই বিধ্বস্ত হবে। ইহুদী রাষ্ট্র এ লক্ষ্যে খনন কাজ চালালেও দুনিয়াকে বুঝাচ্ছে আমরা আসলে ৭০ সালে বিধ্বস্ত দ্বিতীয় হাইকলের ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে তালাশ করতেছি। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ।

১৯৯৬ সালে ইসরাঈল সরকার দুটি ইসরাঈলী কোম্পানী ও একটি প্রাচীন নিদর্শন সন্ধানী দলকে বাড়তি খননের অনুমতি দেয়। ১৯৯০ এর ১৮ আগস্ট ইসরাঈলের পূরা তওবীদ জুসেক জর্জ এই পূরাতত্ত্ব তালাশের আসল মতলব বলে দিয়েছিলেন আমরা আসলে আধুনিক উপকরণ প্রয়োগ করে মসজিদে-আকসাকে বিধ্বস্ত করতে চাই। এটা রাখঢাকের বিষয় নয়। এর উপরই হাইকলে সোলেমানী নির্মিত হবে।

২. সুড়ঙ্গ খনন ঃ প্রদত্ত তালাশের নামে খনন কার্যের পাশাপাশি মসজিদে আকসার নিচে সুড়ঙ্গ নির্মাণ কাজও চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এগুলো আসলে নির্মাণ করা হচ্ছে পরিকল্পিত হাইকলের জন্যেই। আলেশমো নাইম ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারীভাবে সুড়ঙ্গ তৈরির উদ্বোধন করেন। সরকারী এই উদ্বোধন আসলে এ বার্তাই দিচ্ছিলো যে মসজিদে আকসা ভেঙ্গে হাইকল বানাবার জন্যে যা যা করতে হয় সরকার পর্যায়ক্রমে তার সবটাই করবে । গোপনে গোপনে চারশো মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরি হবার পর কুদস শহরের তৎকালীন মেয়র লিডি কলিক বিশাল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে এর জানান দেন। এ অনুষ্ঠান যেনো বলে দিচ্ছেলো ইহুদীরা ধ্বংসের অভিপ্রায়ে আল-আকসা ক্যাম্পাসে হাজির। সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে গেছে। উপরে যদিও মসজিদ দেখা যায়, কিন্তু নিচেই তৈরি হয়ে গেছে ইহুদীদের আস্তানা সুড়ঙ্গের মধ্যে ইহুদীরা তাদের উপাসনা শুরু করে দিলো। কিন্তু এভাবে আর কতো দিন চলবে— ইহুদীদের যে তর সইছেনা অতএব ইসরাঈল সরকার কুদস শহরের নতুন মানচিত্র প্রকাশ করলো। এখানে সুড়ঙ্গের উপরে বিদ্যমান মসজিদের ছবি ছিলো না। ছিলো হাইকলে সোলেমানীর ছবি।

ইসরাঈল সরকার সুড়ঙ্গ নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের মাধ্যমে আরবদের প্রতিক্রিয়াও জেনে নিলো। এর ফলে তারা কতোটা উদ্বিগ্ন বা উত্তপ্ত। বুঝে নিলো পরবর্তী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে আরবদের পক্ষ থেকে কী পরিমাণ ঝুঁকি আসতে পারে

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেনইয়াহু তার স্মৃতিচারণে বলেছেন আমার শাসনামলে কাজটি সম্পন্ন হলো। এটি এমন এক প্রকল্প, যা এক যুগ ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছিলো না। কাজটি করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। কেননা এই কাজটি আমাদের অস্তিত্বের মৌলিক দিকগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। (আল ওয়াতান, কুয়েত - ২৮/৯/ ১৯৯৯)

সুড়ঙ্গ তৈরির কথা জানাজানি হয়ে গেলে চারদিকে হুলস্থুল পড়ে গেলো। দুনিয়া জুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ইসরাঈলের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলো। আরব নেতারা যেনো অনেক দিন পরে হঠাৎ করে হুংকার দিয়ে উঠলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেই হুংকার বাতাসে মিলিয়ে গেলো। ইসরাঈলের সাথে তারা আলোচনার টেবিলে বসে গেলেন। আলোচনা চলছিলো বটে, কিন্তু ইসরাঈল ঠিকই সুড়ঙ্গের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। এ নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

৩. মুসলমান ও ইহুদী বসতির মধ্যখানে কাঁটাতারের বেড়া ঃ

ইহুদীরা একটি ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য যে কোন হামলার দরজা বন্ধ করে রাখতে তারা খুবই তৎপর। আল-আকসা ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ লেগে গেলে ইহুদী এলাকায় কোনো মুসলমান যাতে ঢুকতে না পারে, এজন্যে নিহত হবার এক বছর আগে ইসহাক রবিন মুসলমান ও ইহুদী বসতির মধ্যখানে ৩৬০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এক বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর নকশা প্রণয়ন করেন ইসরাঈল পুলিশ প্রধান মোর্শেদ হাসাক। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ এর অনুমোদন করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে এই প্রজেক্টের উপর কাজ শুরু হয়।

মুসলিম আত্মঘাতি হামলা প্রতিরোধের নাম করে আন্তর্জাতিক মহলের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে ইসরাঈল সরকার এই বেড়া নির্মাণ করে। ক্লিনটন প্রশাসন এর বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে। বেড়া নির্মাণের বিপুল পরিমাণে অর্থ সহায়তা চালকহীন গোয়েন্দা বিমান সরবারাহ করে প্রকল্প এলাকায় সার্বক্ষণিক নজরদারী, বেড়া নির্মাণে প্রয়োজনীর প্রযুক্তি ও উপকরণগত সহায়তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দার মুখে বেড়া নির্মাণে ইসরাঈলকে অব্যাহত সমর্থন দান, ইসরাঈলের নিরাপত্তা ঝুঁকির ধোয়া তুলে অব্যাহত প্রোপাগান্ডা— সব ক্ষেত্রেই আমেরিকা ছিলো দারুণ উৎসাহী।

এই বেড়ায় এমন সব ইলেকট্রনিক দরজার ব্যবস্থা করা হয়, যা আশপাশে ভূগর্ভস্থ তথ্যও সরবরাহ করবে। এই বৈদ্যুতিক কাটাতারের ফলে মুসলমানরা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বসতিগুলো হয়ে পড়ে অঘোষিত কারাগার। মুসলমানরা আর বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নজর তুলে তাকাবে এই সুযোগও থাকলো না। ইহুদী প্রশাসন যখন দরকার মনে করে দুনিয়াকে দেখাবার জন্য জুমআর নামাজের সময় দরজা খুলে দিয়ে মসজিদে মুসলমানদের আগমন করার সুযোগ করে দেয়।

আমাদের অনেকেরই চিন্তার দেউলিয়াত্ব ও বেকুবির মাত্রা বুঝার জন্য একটি বিষয় রয়েছে এই বেড়ার মধ্যে। তারা ভাবেন বেড়া নির্মাণের মাধ্যমে ইসরাঈল কার্যত ফিলিস্তিনী সীমানাকে স্বীকার করে নিলো। তাদের জানা উচিত স্বপ্নে পাওয়া এই কল্পনাকে মনে জায়গা দেয়ার সুযোগটিকেও বহাল থাকতে দেননি শিমন পেরেজ। তিনি বলেছেন ফিলিস্তিনী সীমানা-টিমানা নয়, এই বেড়ার সম্পর্ক নিরাপত্তার সাথে। এই বেড়া কোনো সীমানার দিকে ইঙ্গিত করবে না। (আখবার আল-আলমুল ইয়াউম ২/৩/১৯৯৯) যদি তা সীমানার ইঙ্গিত না করে তাহলে ইঙ্গিত করছে কীসের ? এর উত্তর পাওয়া যাবে তাওরাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাবালা এর মধ্যে। সেখানে লিখা আছে কুদসের গুণ হলো সে 'শখীনাহ' অর্থাৎ এমন সাম্রাজ্য যার অধীনে থাকবে গোটা দুনিয়া। এর চারপাশে থাকবে সুউচ্চ বেড়া। যাতে অন্ধকারের অনুসারীরা এখান পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে। কুদসের দেয়ালগুলো হবে সুউচ্চ যাতে পৃথিবীতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বেড়ার আসল ইঙ্গিত কোনদিকে তা অস্টষ্ট থাকার কথা নয়।

এই বেড়ার পিছনে আছে যুদ্ধোন্মাদনা মুসলমানদের অবরুদ্ধ করার অভিসন্ধি আর আছে ইহুদীদের ধর্মাশ্রিত বর্ণবাদী উগ্রতার চর্চা। ইহুদীরা কখনোই সামনা-সামনি মোকাবেলা পছন্দ করে না। তারা আশ্রয়ের ছায়ায়, আড়ালে-আবডালে ষড়যন্ত্র করতে চায়। কোরআনের ঘোষণা— ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করবে না। তবে যা করার করবে দূর্গের আড়ালে, বসতিতে থেকে প্রাচীর ও বেড়ার পশ্চাতে আবস্থান করে।'

তৃতীয় হাইকল কখন কীভাবে

খ্রিস্টানদের দৃষ্টিতে তৃতীয় সহস্রাব্দের আগমন ইতিহাসের গতি পাল্টানো এক মাইল-ফলক। এরপর থেকে নতুন বিশ্বব্যবস্থা চালু হবে। সেই বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ। নেমে আসবেন পৃথিবীতে খ্রিস্টীয় আধিপত্যের মহারূপকার। ইহুদীরা তার সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে তিনি পৃথিবীতে এসে শেষ করে দেবেন ইহুদীদের সকল শত্রুকে। তার আগমনের জন্য প্রস্তুত পৃথিবী' গড়ে তুলা ইহুদীদের দায়িত্ব। তিনি আসবেন অদৃশ্য জগত থেকে। তার আগমনের আগেই চাই তার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তার আগমনের আগেই স্টেজ প্রস্তুত করে রাখা চাই। সেই স্টেজই তো আল-কুদস, সেই সিংহাসনই তো হাইকলে সোলেমানী।

প্রস্তুতিমূলক সাম্রাজ্য অবশ্য ইহুদীরা তৈরি করে ফেলেছে। ইসরাঈল রাষ্ট্রই হলো সেই সাম্রাজ্যের পীঠস্থান। যা সম্প্রসারিত হয়ে এক পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে বিস্তৃত হবে। এখনকার সবচে' বড় কাজ হলো হাইকলে সোলেমানী প্রতিষ্ঠা। এটাই এখন প্রত্যেক ইহুদীর অগ্রাধিকার। উগ্র ইহুদীদের এটা না বানিয়ে চলছে না, সেক্যুলার দেরও চলছেনা উগ্রবাদীরা ধর্মের নামে আগুন জ্বালিয়ে এটা করতে চায় আর সেক্যুলাররা কাজটি করতে চায় ধর্মনিরপেক্ষতার ছায়াতলে দাঁড়িয়ে।

এই প্রচেষ্টায় খ্রিস্টানরাও ইহুদীদের অংশীদার। তাদের বিশ্বাস হলো-যিশুখ্রিষ্ট ইহুদীদের খ্রিস্টান বানাবেন। সহসা ইহুদীরা বুঝতে পারবে, যার অপেক্ষা এতো দিন তারা করছে তিনি আসলে যিশুখৃস্ট। তখন তারা যিশু খৃস্টের অনুসারী হয়ে যাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাবে। এ বিশ্বাসই খ্রিস্টানদের উৎসাহ যোগাচ্ছে ইহুদীদের পাশে দাঁড়াতে বিগত একশো বছর ধরে খ্রিস্টবাদী দুনিয়া ইহুদীদেরকে যে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে তার গোড়ায় আছে এই ধর্মীয় অভিপ্রায়।

আমেরিকান লেখক লিউব্রিনের বক্তব্য হলো— প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের বড় এক অংশ ইসরাঈল রাষ্ট্রকে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সফল বাস্তবায়ন হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদের আকিদা মতে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জড়ো হওয়া আসলে যিশুখ্রিস্টের হাতে তারা খ্রিস্টান হবে এরই পূর্বলক্ষণ। একারণে কুদস শহরে আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান মিশনের ১৩ মিশনারী গ্রুপগুলো অন্য ধর্মাবলম্বীদের খৃষ্টান বানাবার জন্যে দিন-রাত এক করে ফেললেও ইহুদীদের তারা দাওয়াত দেয়না। ইহুদীদের মধ্যে মিশনারী তৎপরতা তাদের মতে নাজাইজ। কারণ এরা যিশুখৃস্টের হাতে স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান হবে এটাই বাইবেলের সিদ্ধান্ত।

যিশুখ্রিস্ট কোথায় অবতরণ করবেন ঃ খ্রিস্টানদের মতে যিশু খ্রিস্ট কুদস শহরে অবতরণ করবেন। তিনি তাঁর মিশন উদ্বোধন করবেন হাইকলে সোলেমানী থেকে। এ কারণে হাইকল তৈরি হওয়া জরুরি। এই চিন্তাধারা ইহুদী খ্রিস্টান মেলবন্ধন তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ। ইহুদীরা যাবতীয় কর্মকান্ডে খ্রিস্টানদের সমর্থন ও সহায়তা পাচ্ছে। কারণ ইহুদীরা যা করছে এর ফলাফল নাকি ভোগ করবে খ্রিস্টানরা।

যায়নবাদীদের এক নেতা জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীকে বলেছিলো আপনারা যিশু খৃস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়, আর আমরা প্রতীক্ষা করছি প্রথম আবির্ভাবের। অতএব উভয় সম্প্রদায় মিলে আসুন, হাইকলটাকে বানিয়ে ফেলি। তারপর আমাদের মধ্যে যে সমস্যা আছে, ঈসা মসীহের মাধ্যমে এর সমাধান করা যাবে।

হাইকল আসলে ইসলামের আগে এবাদতখানাকে বলা হতো। ইসলামের সময়কালে মসজিদে-আকসার বিভিন্ন অংশে ইহুদীদের সেই হাইকলের কিছু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিলো। প্রাচীন হাইকলটি ছিলো পৃথিবীতে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ। মক্কার প্রথম মসজিদ নির্মাণের ৪০ বছর পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর নির্মাণ শুরু করেন। এরপর বনী ইস্রাইলের নবীগণের কিবলা ছিলো এটি। হিজরতের পর কাবাঘর কিবলা হওয়ার আগে মুসলমানরাও এর দিকে রুখ করে নামাজ পড়তেন। পরবর্তীতে তা কিবলা না থাকলেও মুসলমানদের সাথে এর সম্পর্ক হলো আত্মা ও দেহের অনুরূপ। হুজুরে পাক (সাঃ) এর মেরাজ ও ইসরার ঘটনা এই সত্যই প্রমাণ করে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এখন মুসলমানরা। তাওহীদের লালনভূমি এই পবিত্র মসজিদের উপর ত্রিত্ববাদী কুফুরী শক্তির কোনো উত্তরাধিকার থাকতে পারে না। এ কারণে দেখা যায় মক্কা বিজয়ের পরে এই পবিত্র ভূমির দিকে ইসলামী অভিযানসমূহ প্রেরিত হতে লাগলো। যার সূচনা হয়েছিলো তাবুক যুদ্ধের মাধ্যমে আর সমাপ্তি হয় ওমর (রাঃ) এর গৌরবময় খেলাফতকালে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর হাত দিয়ে হাইকল নির্মিত হবার পর তাওহীদের চর্চাকেন্দ্র হিসেবে এই ভূমি মর্যাদা অর্জন করেছিলো। এখন মুসলমানদের হাতে না থাকার অর্থ হলো এটা শিরকের চর্চা কেন্দ্র হয়ে উঠা। মুসলমানদের কাছে হাইকল শরীফ আল্লাহর ইবাদতের মসজিদ হয়ে আছে। অর্থাৎ তার আসল মর্যাদায় টিকে আছে। দ্বিতীয় হাইকল ভেঙে ফেলার দুই হাজার বছর পরে এবং মুসলমানদের হাতে মসজিদ নির্মিত হবার প্রায় শাড়ে চৌদ্দশো বছর পরে ইহুদীরা তৃতীয় হাইকল বানাতে চায়। এটা আসলে এমন এক দাবী যা শক্তির জোরে উচ্চারণ করা যায়

কিন্তু যুক্তি দিয়ে এর যথার্থতা প্রমাণ করা যায় না। প্রথম হাইকল বুখতে নসরের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছিলো খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ আব্দে। দ্বিতীয় হাইকল ৭০ খ্রিস্টাব্দে নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো রোমান সম্রাট টাইটসের হাতে। এরপর ইহুদীরা কখনো হাইকল নিয়ে উচ্চাবাচ্য করেনি। এখন তাদের খায়েশ জেগেছে এটা বানাবার।

শুধু খায়েশ নয়, ইহুদীরা এক্ষেত্রে এতোটাই মরিয়া যে নারী বৃদ্ধ সহ প্রতিটি ইহুদী হাইকলের প্রশ্নে তিল পরিমাণ ছাড় দিতে রাজী নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে প্রথম সম্বোধনের ইহুদী পদ্ধতি ছিলো কাল আমরা জেরুসালেমে মিলিত হবো। যায়োনিস্ট নেতারা এটাই তাদেরকে শিখিয়েছিলো। তারপর তারা যখন জেরুসালেম দখল করে বুরাকের দেয়াল তথা তাদের ভাষায় গীরিয়া দেয়ালে জড়ো হলো, তখন তাদের ধর্মীয় নেতা সেখানে সবাইকে নিয়ে উপাসনা করলো। এবং দোয়ার মধ্যে উপস্থিত ইহুদীদের কাছ থেকে এক অঙ্গীকার গ্রহণ করলো। সে দোয়া করলো— হে প্রভূ। আমরা হাইকল বানিয়েই তবে নিঃশ্বাস নেবো। এই শপথ থেকে যদি আমরা চুল পরিমাণ বিচ্যুত হই, তাহলে আমাদের কণ্ঠনালী ছিন্ন করে দিয়ো। প্রার্থনার উপরে উপস্থিত সকলেই ঐক্যমত পোষণ করলো। ১৯৬৭ সালে যখন ইসরাঈল সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ আল-কুদসে প্রবেশ করছিলো তখন তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো এই দোয়াটি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ুন এই দোয়া পড়ে পড়ে আল-কুদসে প্রবেশ করছিলো। তার সামনে ছিলো ইহুদীদের ধর্মীয় নেতা শিলূ মোগ্রিন। ইসহাক রবিনও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ডায়রিতে সেই মুহূর্তগুলোর আবেগ উত্তাপ ও প্রভাবের বিবরণীতে লিখেছেন— আমাদের ধৈর্য ধারণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক সুযোগ আসছে আমরা যেনো তা বিনষ্ট না করি। আজ আমরা গীরিয়া দেয়ালে উপনীত হলাম। এই সেই দেয়াল, যা ইসরাঈলের প্রতীক, প্রাণশক্তি। আজ যে মহান লগ্নটি এলো, জীবনভর স্বপ্ন দেখেছি এই সময়ের জন্য। স্বপ্ন দেখেছি যে দলটি দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছবে, তাদের সাথে শরীক থাকার জন্য। আর ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও হাইকল নির্মাণে শরীক থাকার জন্য। ভাবছি আর বিস্মিত হচ্ছি কীভাবে এই স্বপ্নের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারলাম। জীবনে তা ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে করতাম না। আজ লজ্জা হচ্ছে কেন তা সম্ভব মনে করতাম না এজন্যে।

এই কথাগুলো লিখার সময় তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর চিফ কমান্ডার। পরে লেবার পার্টির সেক্যুলার সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ইসরাঈলী প্রেসিডেন্ট যেলম্যান শাযার সেদিন খোলা পায়ে গীরিয়া দেয়ালের দিকে এগুচ্ছিলেন। দেয়ালের

চারপাশে ছিলো ইহুদীদের ভিড়। ফ্রান্সের বিখ্যাত সাংবাদিক জ্যানুয়েল সেই দৃশ্যের বিবরণে লিখেছেন বিজিত শহরে প্রবশ করলেন যেলম্যান শাযার ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট। দাঁড়ালেন গীরিয়া দেয়ালের সামনে মহান সুলাইমানের এবাদতখানা এই দেয়াল এখানে আজ স্বাধীন ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট এসে হাজির। কী সেই আবেগ কম্পিত অভাবনীয় দৃশ্য। সেই সময় ধর্মীয় চেতনার যে তরঙ্গ খেলে গেলো, ইসরাঈলের শত্রুরা তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে পারে ? ইহুদীদের যে দিন থেকে আল-কুদস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেদিন থেকেই তাদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত বেদনাদীর্ণ। আজ দেখলাম দুই হাজার বছরের সেই যাতনার উপশম দৃশ্য।' সেই দিনই ইহুদীরা হাইকল নির্মাণ কাজের অঘোষিত উদ্বোধন করে ফেললো। কিন্তু হাইকল নির্মাণের চিন্তা শুধু কি ইহুদীদের মাথায়ই খেলা করছে ? এই চিন্তা শুধু কি খ্রিস্টানদের ঘুম হরণ করছে ? না, কেবলই তা নয়।

বরং ফ্রিমিশন নামে তথাকথিত ধর্মাবলম্বীদের অসংখ্য কর্মী বুকের ভিতর ইহুদী পরিকল্পনার বিষ নিয়ে তৎপর রয়েছে। ফ্রি মিশনের পরিচয় সম্পর্কে প্রাচ্যবীদ ডুজি লিখেছেন— এটা আসলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এক আন্দোলন। যারা মূলত হাইকল পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সক্রিয় রয়েছে। যদিও হাইকল ইসরাঈলের প্রতীক এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ফ্রিমিশন ও আরবীয় ফ্রিমিশন উভয়ই সমান। ১৯০১ সালে নিউয়র্কে প্রকাশিত মিশনের এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছিলো ইউরোপীয় ফ্রিমিশন এমন এক অট্টালিকা তৈরি করবে, যেখানে ইহুদীদের প্রভুর উপাসনা সার্বক্ষণিকভাবে চলবে।

অপরদিকে আরব ফ্রি মিশনের নেতা ইদ্রিস রাগীবের বক্তব্য হলো— হাইকলের অপরিহার্য পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অকাট্য। ফ্রি মিশন কর্মীদের এই ঘোষণা কেবলই ঘোষণা ও অঙ্গীকারে সীমাবদ্ধ নয় বরং তারা এক্ষত্রে আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হচ্ছে।

হাইকল নির্মাণে ইট-পাথরের প্রয়োজন। কিন্তু ইহুদীদের হৃদয়ে এই হাইকলের কল্পিত নির্মাণ হয়ে গেছে নানা কাহিনীর ইট পাথর দিয়ে। তারা এই হাইকল সম্পর্কে কতো গল্প যে ফেদেছে, এর কোনো শুমার নেই। কল্পিত সেই হাইকল এখন বাস্তব কাঠামোয় রূপ নিতে চায়। ইহুদীদের এখন আর কাহিনীর পাথর নয় বরং বাস্তব পাথরের প্রয়োজন।

প্রথম পাথর ঃ এক ইহুদী সংগঠন ১৯৯০ এর দশকে হাইকলের ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে দুনিয়ার সেরা পাথর বাছাইয়ের কাজে হাত দেয়। তারা সোয়া পাঁচ টন ওজনের এক পাথর বাছাই করে। ১৯৮৯ এর অক্টোবরের পনেরো তারিখ এ

পাথরটিকে মসজিদে আকসার দরজার কাছে এনে রাখা হয়। একাজের উদ্বোধনকালে সেই সময়কার হাইকল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জরশন সোলেমন বলেন— হাইকলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নতুন এক যুগের সূচনা। আমরা ইহুদীদের স্বাধীনতার নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই (শরকুল-আওসত ১৬/১০/ ১৯৮৯)

পাথরের বিষয়টি কিছুদিন যেতে না যেতেই নিছক পাথর হয়ে থাকলো না। বরং তা এমন এক পর্যায়ের পর্দা উন্মোচন করলো যা সত্যিই নতুন ইঙ্গিতবাহী। কেননা হাইকল প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে রত সংগঠনগুলো এভাবে দুনিয়া বাছাই করা পবিত্র পাথর একত্রিত করাকে ইবাদত হিসেবে ভাবতে লাগলো। ১৯৯৭ সালের আগস্টে ফ্রান্সের নিউজ এজেন্সি এক রিপোর্ট ছেপেছিলো। তাতে লিখা হয়— চরমপন্থী ইহুদীরা আল-কুদস শহরে নিজেদের হাইকল নির্মাণে সব ধরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে চলছে। তারা নকব উপত্যকা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাথর জড়ো করছে হাইকলের জন্য। এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্যে ছয় মিলিয়ন পবিত্র পাথরের প্রয়োজন। রিপোর্ট মতে হাইকলের নকশা ইতোমধ্যে আমেরিকায় তৈরি করা হয়েছে। এর পিছনে কর্মরত ছিলেন বিশেষ ইহুদী ইঞ্জিনিয়ারগণ। প্রস্তাবিত নকশাটিকে ইসরাঈল সরকারের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। হাইকল নির্মাণ কাজের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর এখন শুধু সরকারী নির্দেশের আপেক্ষা করা হচ্ছে। (শরকুল-আওসত ১৯/৮/১৯৯৭) ছয় মিলিয়ন বিশেষ পাথর জড়ো করা সহজ কথা নয়। কিন্তু ইহুদীদের কাছে কোন কাজটি আজ কঠিন ? বহু সংগঠন এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। তারা এই মহাকর্তব্য সম্পাদনের কোনো ধরনের বিলম্ব সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। ইসরাঈলী পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ধনকুবের লূই বংশের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলে পাথর উত্তোলনের বিশেষ যন্ত্রপাতি রয়েছে। সেখানে বৃহৎ সব পাথরের অভাবনীয় স্তুপ গড়ে উঠেছে। যখনই প্রয়োজন পড়বে ইহুদীরা তাকে কাজে লাগাতে পারবে। হাইকল বানাবার জন্যে এগুলোকে কুদস শহরে নিয়ে আসা হবে (খালিজ পত্রিকা ১১/৬/১৯৯৭) ইহুদীদের একটি সংগঠন রয়েছে যার কাজ কেবল পাথরের ব্যবসা। এই সংগঠন শুধূ নকব প্রান্তরের পাথরেরই ব্যবসা করে। এই সংগঠনের নেতা ইয়েনুরের বক্তব্য হলো ছয় মিলিয়ন পাথর জড়ো করা কঠিন এক বিষয়। অতএব আমরা তাওরাতের বৈশিস্ট্য অনুযায়ী পাথর সংগ্রহ করে বিক্রি করছি। যাতে তা দুষ্প্রাপ্য না হয় আমি যখন পাথর স্পর্শ করি স্থানান্তরিত করি মনে হয় আমি আসলে জান্নাতেরই কোনো বস্তু নাড়াচাড়া করছি। (আল-খলীজ, ৯/৮/১৯৯৭) পাথর নিয়ে ইহুদীদের এই জাতিগত অহংকার ও পবিত্রতার অনুভব বিস্ময়কর এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে। প্রথম দিকে একে

নিছক হুজুগ মনে হয়েছিলো কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেলো এই হুজুগও বিশেষ শৃংখলা ও পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গতিশীল। রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ এর পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন।

ফলাফল এই দাঁড়ালো, কোনো কোনো সংগঠনের সদস্যরা আল কুদস ক্যাম্পাসের পাথরকে এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ শুরু করলো, যাতে পাথরগুলো থেকে তাওরাতের আসর পেতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হলো। এবং পাথর সংক্রান্ত কর্মকান্ডে রাষ্ট্রও অংশ গ্রহণ করলো। ১৯৯৭ সালে কুদস শহরে ইসরাঈলী মিউনিসিপ্যালিটি ইসরাঈলী পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এক হাইওয়ের প্লাট ফরমে ব্যবহৃত পাথর উত্তোলন শুরু করে। কারণ এই পাথরগুলো তাওরাতী পাথর ছিলো। এগুলো উত্তোলনের জন্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলারের বাজেট অনুমোদন করা হয়। (আল-খলীজ, ১৪/৬/১৯৯৭)

পাথরের পরে কী ঃ ইহুদীদের প্রত্যাশা ছিলো হাইকল নির্মাণ কাজ সূচনার আগে মসজিদে আকসা ভেঙ্গে ফেলবে। কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। ঘটনা ঘটলো তাদের প্রত্যাশার বিপরীত। ফলে জাতিগত ইতিহাসের নানান অভিজ্ঞতা থেকে ইহুদীরা বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিলো। ১৯৯৭ সালের আগস্টে ফ্রান্স নিউজ এজেন্সি এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে লিখা হয়— হাইকলের সাথে সম্পৃক্ত ইহুদীদের প্রাচীন প্রথা ও কিংবদন্তিগুলোর পুনরোজ্জীবনের চেষ্টা চলছে। প্রথাগুলোর মধ্যে এমন সব প্রাণীর কোরবানীর বিষয়টিও রয়েছে, যেগুলোর সাথে ইহুদীদের বিভিন্ন নিদর্শন জড়িত আছে। যায়নবাদীরা নতুন প্রজন্মকে এই শিক্ষা ও চেতনায় বলিষ্ঠ করে তুলছে, যাতে তারা হাইকল সম্পর্কিত বর্ণনা, প্রথা ও ইবাদতগুলোকে যে কোন মূল্যে আদায় করে। ইহুদীদের দৃষ্টিতে হাইকলের কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করে ফেলা আবশ্যক। কেননা এরপরই নেমে আসবে ইহুদীদের স্বর্ণযুগ।

যায়োনিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম গ্রন্থের লেখক ইমানুয়েল হাইম্যান লিখেন— ইহুদী মৌলবাদের সবচে বড় চিন্তাধারা হলো যে কোন মূল্যে তৃতীয় হাইকল পুনঃনির্মাণ করতে হবে। তিনি লিখেন— কুদস শহরে তালমুদী একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ছাত্রদেরকে বিশেষ শিক্ষা ও ভাবধারায় গড়ে তোলা হয়। যাতে হাইকল নির্মিত হয়ে গেলে তারা হাইকলের কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিতে পারে। এই মহান ভবিষ্যতের প্রস্তুতির জন্য ইহুদী সেবকদেরকে তাওরাতে বিশেষজ্ঞ করে তোলা হচ্ছে। যাতে তারা ভবিষ্যতে এমন সব উপাসনা চালু করতে পারে, যা হাজার বছর পূর্বে ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। সেই উপাসনার সুবিধার্থে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম তৈরি করা হচ্ছে। কুরবাণীর রক্ত সংরক্ষণের জন্য পিতলের বর্তন, পবিত্র

পানীয়ের জন্য বিশেষ ধরনের পেয়ালা, সম্মিলিত উপাসনায় আহ্বান করার জন্য উন্নত ধরনের সিংগা তৈরি করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

গীরিয়া দেয়ালের কয়েক কদম দূরে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগ্রহী লোকদেরকে এতে উপাসনার বিভিন্ন উপকরণ দেখানো হয়। যায়নবাদী নেতা মোনায়েম মকুফর আশাবাদ ব্যক্ত করেন, জাদুঘরের পবিত্র আসবাবগুলোকে একদিন তিনি নিজেই পবিত্র হাইকলে স্থানান্তর করবেন। তিনি বলেন 'হাইকল নির্মাণ প্রত্যেক ইহুদীর দায়িত্ব, ঈশ্বরের নির্দেশ। এটা নির্মাণের জন্যে তাই নিজে এগিয়ে আসুন, অলৌকিক কিছুর অপেক্ষা করবেন না।'

তবে ইহুদীরা হাইকলকে এমনভাবে নির্মাণ করতে চায়, যাতে এটা পরিণত হয় মানবসৃষ্ট এক অলৌকিক বস্তুতে। এজন্যে প্রাচীন ও আধুনিক সব ধরনের উপকরণ প্রস্তুত করা হচ্ছে। রেশাদ নামে এক পাদ্রী হিযকিল গ্রন্থে হাইকলের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন— 'সঠিকভাবে বলতে গেলে এই ভবিষ্যদ্বাণী এখনো পূর্ণ হয়নি। ভবিষ্যতে তা পূর্ণ হবে। বালাখানা হবে বিস্ময়কর ও তুলনাহীন। সেটি হবে এতোই জাকজমকপূর্ণ যে, সোলাইমান (আঃ) নির্মিত হাইকল এর ধারে কাছেও আসতে পারবে না।'

ইসরাঈলের এখানে ওখানে এমন সব ধর্মীয় এমন সব উপকরণ চোখে পড়ে, হাইকলে তীর্থযাত্রীদের জন্য যা তৈরি হয়েছে। যেমন উপাসনার জন্য বিশেষ ধরণের কাপড়-চোপড়, পশু কোরবাণীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের মর্যাদাময় প্লেট, পবিত্র মদসহ আরো কতো কিছু।

শামাদানের কাহিনী

কল্পকথার বাতি জ্বালিয়ে ইহুদীরা পাল্টে ফেলতে চায় দুনিয়ার গতিধারা

সাতকোন বিশিষ্ট পবিত্র শামাদান সম্পর্কে কতো রঙের কাহিনী যে ইহুদীরা ফেদেছে, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। ইহুদীদের কাছে এটা ধর্মীয় নিশানা। এর সাত কোন দুনিয়া সৃষ্টির সাত দিনের ইঙ্গিতবাহী। তাওরাতেও আছে এই শামাদানের কাহিনী। ইহুদীদের বিশ্বাস, এই শামাদানে আছে মহাকালের মুকুট। এ কারণেই এই শামাদান ইসরাঈলের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। ইসরাঈলের কাগজী নোটে এই শামাদান, সিকি-আধুলিতেও এই শামাদান, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যানারে এই শামাদান, সামাজিক মাহফিলগুলোর স্টেজে এই শামাদান, আর উপাসনালয় মানেই তো সেখানে শামাদান আছে! ইহুদীবাদীরা একদিন হাইকল বানাবে, তারপরের কাজ কী? তারপর হাইকলের পবিত্রতা চূড়ান্ত হতে হলে এই শামাদানের আলোয় তাকে আলোকিত করতে হবে। ইহুদীদের জাতিগত ইতিহাস এই শামাদানের আলোয়ই আলোকিত। আর রাজনীতিও আলোকিত হতে হলে শামাদানের আলোতেই অবস্থান করতে হবে।

সাতকোন বিশিষ্ট শামাদান একটা নয়। অনেকগুলো। তবে সবচে পুরাতন শামাদানই সবচে বরকতময়। এর তালাশ চলছে হন্যে হয়ে। সেটার বরকতে বরকতময় হতে থাকে বাকি সব শামাদান। অতএব নতুন শামাদানও নির্মিত হচ্ছে প্রচুর। হাইকল প্রতিষ্ঠাতা আন্দোলনের নেতা বারুখ বিন ইউসুফ ১৯৯৭ সালের আগস্টে ফরাসী নিউজ এজেন্সিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন— আমাদের সংগঠন বিশাল এক স্বর্ণের শামাদান তৈরি করেছে আমেরিকায়। পরে তাকে ইসরাইলে পাঠানো হয়েছে। আমাদের সংগঠন আরো সংগঠনের সাথে, মিলে এমন সব ধর্মীয় নেতা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যাদের দ্বারা হাইকল পরিচালিত হবে এবং জাতীয় নিদর্শনগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

মিসরের এক ইহুদী মিলিয়নিয়ার মোশে পরেখ তার বন্ধু বেঞ্জামিন নেতা নিয়াহুর সহযোগিতায় আমেরিকায় আরেকটি সোনার শামাদান তৈরি করেন। নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী হবার আগের ঘটনা এটি। কুদস শহরের সাবেক মেয়র এহুদ ওলমার্ট শামাদান তৈরি করেছেন। এবং হাইকলে রাখার জন্যে ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে কিছু খিমাও তৈরি করেছেন। খিমাকে ইহুদীরা বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। একে তারা বলে অঙ্গীকার ও বার্তা একত্রিত হবার খিমা। তাদের মতে এই

খিমার উপর দাঁড়িয়েই মুসা (আঃ) ফিরিশতাদের সাথে কথোপকথন করতেন। আর ফেরেশতারা ইহুদীদের মর্যাদার সুসংবাদ তাকে শুনাতেন। বিশাল এই খিমা তৈরি হয়েছে নির্ভেজাল সোনা দ্বারা। মিসরের সেই মিলিয়নিয়ারও তৈরি করেছেন সুবিশাল এক খিমা। তিনি একে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন ইহুদী নেতা শেনইয়াহুর কাছে। এই খিমা নির্মাণে পনেরো মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যয় হয়েছে। (রোজেল ইউসুফ ১৮/৮/১৯৯৭)

ঐতিহাসিক শামাদান সম্পর্কে ইহুদীদের আকিদা বড় চমকপ্রদ। তাদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে বুখতে নসর যখন বায়তুল-মোকাদ্দাস জ্বালিয়ে দিলো, তখন কিন্তু শামাদানটি জ্বলেনি। সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তাকে কেউই খুঁজে পাচ্ছিলো না। না বুখতে নসর, না কোনো ইহুদী। ইহুদীরা তো একে হারিয়ে বসে থাকতে পারে না। তারা তালাশ করে চললো চতুর্দিকে। ধর্মনেতারা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একদিন তা পাওয়া যাবে। বিগত শতাব্দী থেকে ইহুদীরা যখন সৌভাগ্যের নাগাল পেতে মরিয়া হয়ে উঠলো, তখন থেকে শামাদানের অনুসন্ধান নতুন মাত্রা অর্জন করলো।

একদিন খবর পাওয়া গেলো ভ্যাটিকানের কোন এক গুদামে সেই শামাদান নাকি লুকিয়ে আছে। সাথে সাথে ইসরাঈলী গোয়েন্দারা ভ্যাটিকানের অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়লো। এমন কোনো জায়গা বাকি থাকেনি, যেখানে তারা তন্নতন্ন করে শামাদান খুঁজেনি। একসময় তারা হতাশ হলো। পরে এলো নতুন খবর। শামাদান আসলে ভ্যাটিকানেই আছে। কেউ সেটাকে লুকিয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠলো। নড়ে উঠলো ইসরাঈলী প্রশাসন। ইসরাঈল সরকারের আভ্যন্তরীণ জাতীয় কর্মকাণ্ড বিষয়ক মন্ত্রী শীমন শেরুত উড়াল দিলেন ভ্যাটিকানের উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি পোপ দ্বিতীয় জনপলের সাথে সাক্ষাত করে পবিত্র শামাদান তালাশে পোপের সহায়তা কামনা করলেন। স্বর্ণনির্মিত সেই শামাদানের ওজন হলো ৬০ কি. গ্রাম।

(আসসিয়াসত, কুয়েত ৩০/৭/১৯৯৭) কোনো কোনো ইহুদীর ধারণা এই শামাদানকে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্রাট টাইটস। তিনি ভেঙে চুরে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন হাইকলকে।

তাবুতের তালাশ ঃ হাইকলের সাথে সম্পৃক্ত আছে আরেক কাহিনী। সেটা তাবুতের কাহিনী। এ নিয়ে চলছে বাতাস কাঁপানো পর্যালোচনা। মুসা (আঃ) এর আমলে সেই তাবুত ছিলো ইহুদীদের হাতে। একেই ফেরেশতারা ইহুদী বসতি পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিলেন শামবীল (আঃ)-এর সময়ে। যাতে করে হযরত তালুতের

রাজা হওয়ার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়। এর আলোচনা কোরআনে আছে। কিন্তু ইহুদী কিংবদন্তিতে তাবুতের ব্যাপারটা এইটুকুই নয়, এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

ইহুদীদের দাবী হলো তাবুত আবারো তাদের হাতে আসবে। শত্রুদের মোকাবেলায় এরপর থেকে তারা কেবলই জয়ী হবে। কেননা তাবুত ইহুদীদের হাতে থাকা মানেই ইহুদীদের বিজয় অবধারিত। অতএব চলছে চতুর্দিকে তাবুতের তালাশ। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তি পর্বে ইহুদীরা একে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে।

ইহুদীদের বর্ণনা মতে পবিত্র হাইকলে কুদসুল-আকদ্দস নামক স্থানে তাবুতটি রাখা ছিলো। এর মধ্যে তাওরাতের মূল লিপি এবং মুসা ও হারুন (আঃ) বিভিন্ন আসবাবপত্র ছিলো। বনী-ইসরাঈলের প্রথম স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেলে এই নিদর্শনগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। আসলে মুসা (আঃ)-এর রেখে যাওয়া জিনিসগুলোর প্রকৃত হকদার মুসলমানরা। কেননা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমেই নবুওতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়েছে এবং সকল নবীর সকল কামালত এসে তাঁর (সাঃ) মধ্যে পরিপূর্ণ বিকাশ পেয়েছে। এ কারণে তাবুতসহ নবীদের রেখে যাওয়া অন্যান্য জিনিসের উপর উম্মতে মুহাম্মদীর (সাঃ) হক প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু ইহুদীরা তাবুতকে নিজেদের বলে ভাবছে। এবং হাইকলের জন্য জরুরী ভিত্তিতে এটা ছাড়া যেনো তাদের চলছে না। কারণ এটা ছাড়া যে তাদের ধর্মীয় পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব! অতএব তাবুত চাই, তাবুত চাই। কিন্তু কোথায় সেই তাবুত ?

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসরাঈলী পত্রিকা 'মাআরিফ' খবর ছাপে যে মর্যাদাময় সেই তাবুত ইথিউপিয়ায় রয়েছে। এক্ষেত্রে ইহুদী ইতিহাসের এক বিশ্লেষক ও বিশিষ্ট এক পূরাতত্ত্ববিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় হযরত ইসরাঈল (ইয়াকুব) (আঃ) এর কলিক নামীয় পুত্র পিতার ইন্তেকালের পর তাবুতকে ইথিউপিয়ায় স্থানান্তরিত করেন। এই ঘটনার দিকে তাওরাতে নানা ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে। তাওরাতের ভাষ্য মতে তাবুত ছাড়া হাইকল অর্থহীন। কোনো কোনো ইহুদী গোষ্ঠী মসজিদে আকসার নিচে তাবুতকে দাফন করা হয়েছে বলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু অনুসন্ধানের সব ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেও সেটাকে খোঁজে পাওয়া যায়নি। পত্রিকাটি এক ইহুদী ইতিহাসবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে, ইহুদীদের তাবুত দক্ষিণ ইথিউপিয়ায় আকসুম শহরের এক গোপন জায়গায় রয়েছে। এই শহরটি প্রাচীন হাবশার সোলেমান রাজা ও বিলকিছ রাণীর রাজধানী ছিলো। এখানে কলিক ২৫ বছর তার রাজত্ব পরিচালনা করেছেন। পিতার ইন্তেকালের পরে তিনি এ অঞ্চলে রাজ্যশাসক হন। পত্রিকাটি আরোও লিখে, এই গোপন স্থান সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউই অবগত নয়।

তাবুত সম্পর্কে ইহুদী সংগঠনগুলোর মধ্যে আরেকটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সেটা হলো— কুব্বাতুস সাখরার নিচের গভীরতম কোনো অংশে তাবুতকে লুকানো হয়েছে। এটাকে ইহুদীরা বিশুদ্ধ মত হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এ কারণেই মসজিদে আকসা ও কুব্বাতুস-সাখরার নিচে একের পর এক গভীর সুড়ঙ্গ খনন করা হচ্ছে। তবে তাবুতের তালাশ শুধু সুড়ঙ্গের মাধ্যমেই হচ্ছে না। বিড়াল যেভাবে শুটকির গন্ধ পাওয়া মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি ইহুদী সংগঠনগুলো সেখানেই শুনছে তাবুতের কথা, সেখানেই অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তাবুত পেলেই পাওয়া যাবে তাওরাতের মূল লীপি, পাওয়া যাবে আম্বিয়ায়ে বনি ইসরাঈলের আসবাবপত্র। এমনকি ইহুদীরা দাউদ (আঃ)-এর যবুরকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে যবুরকে ইহুদীরা মিসরে নিয়ে গিয়েছিলো, সেটা নাকি আহরামের মাটির তলে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। অতএব সেখানে মাটি খুঁড়ে চলছে যবুরের তালাশ (আল খলীজ, ৫/৬/১৯৯৯)

দেখা যাচ্ছে ইহুদীরা তাদের পূরাতত্ত্ব, অতীত অনুসন্ধান ও জাতীয় নিদর্শনসমূহের অনুসন্ধানে জানবাজী রাখা প্রচেষ্টায় লেগে গেছে। অপরদিকে মুসলমানরা নিজেদের অতীতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। রাজনীতি থেকে দ্বীনকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ইসলামের কালেমাকে পকেটে রেখে সমাজ ও জাতীয় জীবনে শত্রুদের শিখানো সেকুল্যারিজমের কালেমা নিয়ে আত্মহারা উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। কোনো কোনো পত্রিকায় দেখা গেলো আরব লীগের ফিলিস্তিন বিষয়ক এক প্রোগ্রামে ইয়াসির আরাফাত ইহুদীদের পরিকল্পিত হাইকলের নকশা উপস্থাপন করেছিলেন। হাইকলটি যেহেতু মসজিদে আকসা ভেঙেই নির্মিত হবে, তাই সঙ্গত কারণেই তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু আরব নেতারা একে ততটা গুরুত্ব সহকারে নেননি।

ইয়াসির আরাফাত একে আরব লীগের কুদস কমিটির সদস্যদের কাছেও তুলে ধরেছেন। ৫/৫/১৯৯৭ এর রোজেল ইউসুফে প্রকাশিত ২য় যে, হুসনি মোবারকের সাথে এ নিয়ে ইয়াসির আরাফাত কথা বলেছেন। মিসরী সাংবাদিক আদিল হামুদা বলেন কায়রোয় এক সাংবাকি সম্মেলন ডেকে ইয়াসির আরাফাত মসজিদে-আকসা ভেঙে হাইকল নির্মাণের ইহুদী পরিকল্পনার সবিস্তার তুলে ধরেছেন। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন— ইহুদী সংগঠনগুলো হাইকলের জন্য এক মিলিয়ন ডলার চাঁদা সংগ্রহ করেছে। (রোজেল-ইউসুফ, ৫/৫/১৯৯৭) মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত আল-হায়াত পত্রিকায় ৫/৩/১৯৯৭ এ খবর এসেছে যে ইসরাঈল নেতা শেনইয়াহুর কায়রো সফরে প্রেসিডেন্ট হুসনি মোবারক মসজিদে-আকসা ও কুব্বাতুস-সাখরা ভেঙে

হাইকল নির্মাণের ইহুদী পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। শেনইয়াহু তখন এই প্রকল্পের কথা অস্বীকার করেননি। ১৯৯৭ সালে ক্রিসমাস উপলক্ষে বিশপ মাস্কিমোশ শেলুমের নিকট শেনইয়াহুর পক্ষ থেকে হাইকলের একটি মডেল উপহার স্বরূপ পাঠানো হয়। এই মডেল অঙ্কিত ছিলো রূপার একটি নকশার উপর। সেখানে মসজিদে-আকসা ছিলো না, কুব্বাতুস সাখরাও ছিলো না। ফিলিস্তিনীদের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হলে এক ইহুদী নেতা সাংবাদিকদের বলেন এখানে যে মসজিদে আকসা রাখতে হবে, এটা আমাদের খেয়ালে ছিলো না। হাইকলের জন্য যে সকল জিনিস আবশ্যক এর মধ্যে মুকাদ্দাস মাযবুহ অন্যতম। হাইকল পূনর্নির্মাণ আন্দোলন মৃত সাগরের নিকটবর্তী একটি স্থানে মুকাদ্দাস মাযবুহের নির্মাণ সম্পন্ন করে ফেলেছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে হাইকল নির্মিত হওয়া মাত্রই একে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসা হবে। ১৯৯৭ সালের ১৬ই নভেম্বর আল খালীজ পত্রিকায় খবর আসে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত কিছু বহুজাতিক তেল কোম্পানী মোকাদ্দাস মাযবুহ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলো। এবং এর ত্রিশ মিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ অংশটিকে প্রাচীন জবাইয়ের স্থানের আদলে তৈরি করে দিয়েছে।

পত্রিকাটি জানিয়েছে 'মৃতসাগরের নিকটে তৈরিকৃত এই মাযবুহকে আল কুদসের হাইকল স্টাডিজ ইন্সটিটিউটে স্থানান্তরের ব্যাপারে কথা হয়েছিলো। কিন্তু নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তা হয়নি। তবে এর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইহুদীরা 'জবাইয়ের স্থানটিকে' খুবই পবিত্র হিসেবে জানে। এর সাথে জড়িত আছে তাদের বহু উপাখ্যান। এটাকে তারা এতোদিন নির্মাণ করেনি। তৃতীয় সহস্রাব্দের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। তৃতীয় সহস্রাব্দ এসেছে। তৈরি হয়েছে জবাইয়ের জায়গা। আসলে কী জবাই করা হবে এখানে? উত্তর পেতে হলে দশটি লাল গাভীর কাহিনী বুঝতে হবে।

লাল গাভী ডেকে উঠলে জেগে উঠবে ইহুদীদের স্বর্ণযুগ

চরমপন্থী ইহুদীরা ফিলিস্তিনের ব্যাপারটিকে এক গাভীর গল্পের সাথে মিলিয়ে দেখে। গাভী বৃত্তান্ত পুনরোজ্জীবনের মাধ্যমে তারা কোন গাভীর কথা বুঝাতে চায় এটা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। গাভী বৃত্তান্ত বলতে যা জানি, তা হলো মুসা (আঃ) (সূরা আ'রাফে এর উল্লেখ আছে) গাভী বৃত্তান্ত বলতে আরেকটি কাহিনী আমাদের জানা আছে। সূরা বাকারায় এর বিশদ উল্লেখ রয়েছে সূরা বাকারায় ইহুদীদের দাগাবাজী, বাহানাবাযী, অবাধ্যতা এবং স্বভাবের নিকৃষ্টতার আলোচনা রয়েছে। তাদের নবী তাদেরকে গাভী জবাইয়ের হুকুম দিলেন। কিন্তু তারা তাদের মর্যাদাপূর্ণ নবীর সাথেই হঠকারীতাপূর্ণ আচরণের চূড়ান্ত প্রদর্শন করলো। প্রশ্নের পর প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁকে বিব্রত করলো। এটাই ছিলো তাদের মেজাজ। তারা আল্লাহর কোনো বিধানকেই মাথা পেতে মেনে নেয়নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ্যতার হাজারো বাহানা তালাশ করেছে এবং নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটিয়েছে। কিন্তু তারপরও অহংকারের সাথে বলেছে আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়ভাজন (সূরা মায়েদা ১৮)

ইহুদীরা নিজেদের ইতিহাসের কিংবদন্তি জাতিগত পুরনো গল্প-গুজব ও প্রথার চর্চায় বড় তৃপ্তি পায়। তাদের তৈরি পুরনো গল্প-গাথায় ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করা হয়েছে। তারা এই শ্রেষ্ঠত্বকে পুনরায় ফিরে পেতে চায়। এজন্যে আল্লাহর নির্বাচিত এই সম্প্রদায় বর্ণবাদের সবচে ভয়াবহ প্রয়োগ ক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে ফিলিস্তিনকে। প্রত্যেক ইহুদী আসলে বিচরণশীল একেক বর্ণবাদ। কেননা তারা বংশগত দিক দিয়ে 'আল্লাহর পুত্র!' ভৌগলিক দিক দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্রের অবস্থান হলো সবচে পবিত্র জায়গায়। কালগত দিক দিয়ে তাদের পৃথিবী শাসনের সময়টি হবে মানবেতিহাসের সবচে দীর্ঘায়িত সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ। তাদের এই বিশ্বাসের গোড়ায় আছে বিভিন্ন গল্প-গাথা। কিন্তু গল্প গাথা কি পারে ইতিহাসের ফয়সালা বদলে দিতে ?

গল্পের গাভী ডেকে উঠলো ঃ

১৯২০ সালের কথা। ওয়ার্ল্ড যায়োনিস্ট ইউনিয়ন ও ইংরেজদের মধ্যে ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের হাওলা করে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছিলো। এ সময় আলোচ্য বিষয়গুলোর একটি ছিলো হাইকল পাহাড়ের মালিকানা। ইংরেজদের পক্ষ থেকে ইহুদীদের কাছে জানতে চাওয়া হলো, এই মালিকানা স্থায়ীভাবে না সাময়িকভাবে আপনারা চান ? স্থায়ী মালিকানার জন্যে ইহুদীরা কতোটা ঐক্যবদ্ধ কতোটা আগ্রহী ? উত্তরে যায়োনিস্ট পুরোহিত বাক কোক বলেছিলেন– ইহুদী মাত্রই

এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী যে হাইকল পাহাড় ও এর আশপাশের পবিত্র ভূমি ইহুদীদের চিরকালীন উপাসনা কেন্দ্র। যদিও তা এখন অন্যদের করতলে রয়েছে কিন্তু অচিরেই তা আমাদের হাতে আসবে। হাইকলের জমি আমাদের হাতে আসা মাত্রই আল্লাহ লাল গাভীকে আদেশ করবেন, সে হাম্বা ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে তারপর আমরা শুরু করবো হাইকল নির্মাণ। বনী ইসরাঈলের নবীগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন (আখবারুশ-শারক ১৩/০৫/১৯৯৭)

ইহুদী ধর্মগুরু যে ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা তাওরাতে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে— আল্লাহ মুসা ও হারুন (আঃ) এর সাথে কথা বললেন। এবং নির্দেশ দিলেন– প্রত্যেক বনী-ইস্রাঈলীকে বলে দাও যে, তোমাদের নিকট একটি লাল গাভী আসবে। এর মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি থাকবে না। তার কাঁধে জোয়াল চড়ানো হবে না কখনো। এরপর তোমরা তাকে আলেজর জ্যোতিষীর সোপর্দ করে দিয়ো। এবং জনপদের বাইরে তার সামনে একে জবাই করে দিয়ো। এবং জ্যোতিষী কোরবানীর রক্ত আঙুলে লাগাবে। আর জন মিলনের খিমার সামনে সাত বছর পর্যন্ত আঙ্গুল চাটবে। তারপর তার সম্মুখে গাভীকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। জ্যোতিষী জোক ও কিরমুয জাতীয় পবিত্র কাষ্ঠে আগুন প্রজ্বলিত করে গাভীকে জালানোর কাজ উদ্বোধন করবে। তারপর স্বীয় কাপড় ধৌত করবে।

এই জবাই কেন জরুরি ?

কারণ তাওরাতের হুকুম হলো— 'গাভী জবাই বনী-ইসরাঈল ও ইহুদীদের উপর চিরন্তন এক ফরজ।' কিন্তু ইহুদীরা এই ফরজ কর্তব্য পালন করতে পারলো না। কেন পারলো না? পারলো না এজন্যেই যে, ইহুদীদের ধারণা মতে হাইকলের সম্ভাবনা ছাড়া এই কর্তব্য পালিত হবার নয়। লাল গাভী মূলত হাইকলেরই পূর্ব নিদর্শন। লাল গাভী আত্মপ্রকাশ তখনই করবে, যখন হাইকল নির্মাণ নিশ্চিত হয়ে যাবে। এ কারণেই অতীতে ইহুদীরা লাল গাভী নিয়ে উৎসাহী ছিলো না। কারণ হাইকল নির্মাণের ক্ষমতা তাদের হাতে আসার দূরতম কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না। কিন্তু বিগত শতকে ইহুদীরা যখন রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করলো, তারপর থেকে লাল গাভী সম্পর্কে তাদের উচ্ছ্বাসের বাঁধ যেনো ভেঙে গেলো।

ইহুদীদের ধারণা মতে দুই হাজার বছর আগে ইহুদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী যিনিই হতেন, তিনি ছোট এক লাল গাভী জবাই করতেন। গাভীটির বয়স অবশ্যই তিন বছর হতো। জবাইকৃত গাভীর রক্ত মিশিয়ে দেয়া হতো পানির সাথে। তারপর সেই পানি ইহুদীদের পবিত্রতার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই পানি ব্যবহারের সুযোগ

যিনি পেতেন, তিনিই পবিত্র হাইকলে প্রবেশাধিকার লাভ করতেন। ৭০ ইংরেজি সনে হাইকল গুড়িয়ে দেয়ার আগে হাইকলের প্রথম যামানায় একটি মাত্র লাল গাভী জবাই করা হয়েছিলো আর দ্বিতীয় যামানায় জবাই করা হয়েছিলো আটটি। এখন ইহুদীরা তৃতীয় হাইকলের দ্বারপ্রান্তে। অতএব চলছে গাভী অনুসন্ধান।

কোথায় গাভী ঃ

একথা এখন আর গোপন নয় যে, ইহুদীরা মসজিদে-আকসা ও কুব্বাতুস-সাখরাকে শহীদ করে হাইকল বানাতে ব্যস্ত। তাদের মতে হাইকলকে কেবল তারাই আবাদ করবে, যারা পাক-পবিত্র। আর পবিত্রতা অর্জিত হবে গাভীর রক্ত মিশ্রিত পানি দ্বারাই। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সেই গাভী অজ্ঞাত ও অদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে নতুন শতাব্দীতে ইহুদীদের যারপর নেই প্রচেষ্টা চলছে গাভীটি খুঁজে পেতে। এই গাভীটি অবশ্যই চাই। প্রয়োজনে দুনিয়ার প্রতিটি গাভীকে পর্যবেক্ষণ করা হবে। খোজা হবে কোথায় আছে সেই পবিত্র গাভী, সেই মহামূল্যবান গাভী। আমেরিকান জ্যোতিষী ক্লাইকল্ট এ্যাংলিকান মৌলবাদী হিসেবে খুবই বিখ্যাত। কয়েক বছর আগে ঘোষণা করে বসলেন তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন তাওরাতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে গাভী অনুসন্ধানে। এবং হাইকল তৈরির লক্ষ্যে গৃহীত প্রতিটি উদ্যোগের পিছনে শ্রম দেয়ার জন্য তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। এই জ্যোতিষী ও ইসরাঈলী ধর্মনেতা হামীম রাইটসমেনের যৌথ উদ্যোগে হাইকল ইন্সটিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। যা গাভী ইস্যুতে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৯ সালে এক মিটিং রাইটসমেন রেড ইন্ডিয়ার প্রজাতির লালচে গরু প্রতিপালনের জন্য ফার্ম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। জ্যোতিষীও একে সমর্থন করেন। আমেরিকার মিসিসিপি রাজ্যে ফার্ম তৈরি হয়। জ্যোতিষী পরবর্তীতে এই ফার্মের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন ফিলিস্তিনের হাইফা শহরে। এগুলো আসলে প্রত্যাশিত গাভীকেই খোজে পাবার প্রয়াস।

গাভী পাওয়া গেছে ?

দুই হাজার সাল আগমনের কিছু পূর্বে শুনা গেলো ইহুদীদের ঘোষণা— আত্মপ্রকাশ করেছে প্রতীক্ষিত সেই গাভী। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে এক লাল গাভীর জন্মের ঘোষণা শুনা গেলো। প্রচার করা হলো— গাভীটিতে তাওরাতে বর্ণিত সব গুণই বিদ্যমান। এক চুলও কম বেশি নয়। বেকার হেসিদিম নামের ফার্মে জন্মেছিলো গাভীটি। অবাক করা গাভী তো। সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে গেলো ধর্মযাজকদের কাছে। তাদের এক প্রতিনিধিদল গেলো গাভী পরিদর্শনে। তারা

খুটিয়ে খুটিয়ে সবই দেখলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, হ্যাঁ, এটা, এটাই সেই গাভী। তাওরাতে বর্ণিত বরকতময় গো বৎস। ভক্তিবিগলিত চিত্তে তারা এর জন্য দোয়া করলেন। তারপর এর নিরাপত্তার জন্য কল্পনাতীত ব্যবস্থা করা হলো। (আল আখবার, মিসর, ২৫/০৪/১৯৯৭)

গাভীর ঘোষণা আমেরিকা– বৃটেনের ইহুদী ও প্রোটেস্টান্ট মৌলবাদীদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার এক নতুন অধ্যায়ের পর্দা উন্মোচন করলো। একে কেন্দ্র করে নানা আশাবাদ আশঙ্কা ভবিষ্যদ্বাণী ছড়াতে লাগলো বাতাসে বাতাসে। ১৯৯৭ সালের ৯ ব্রিটিশ পত্রিকা এ্যাবজরুর লিখেছিলেন জন্মের তিন বছর পর ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী জবাই করা হবে লাল গাভীকে।

তারপর শুরু হবে ইহুদীদের নতুন উপাসনালয়ে প্রত্যাবর্তনের পালা। পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন এমন সব ট্রাজেডির জন্ম দেবে, যার জন্য তৃতীয় সহস্রাব্দকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হবে।

পবিত্র গাভীর সংবাদ জানাজানি হলে ইহুদীদের জনস্রোত বইতে লাগলো হাইফার হেসিদম এলাকার দিকে। হাজার হাজার ইহুদী, ছুটে আসছে পশুপালের মতো। অলৌকিক গাভীকে এক নজর দেখার জন্য আগত ইহুদীদের পদভারে যেনো কাত হয়ে যাচ্ছিলো গোটা এলাকা। ভীড় ছিলো অকল্পনীয়। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। এরপর থেকে সুশৃঙ্খলভাবে দর্শনার্থীরা গাভীর মুজিজা দেখে ধন্য হচ্ছিলো। ইহুদীবাদী সংগঠনগুলোর মধ্যে তো ধর্মীয় ভাবাবেগের ঝড় উঠলো। পবিত্র গাভীর নাম রাখা হলো মিলোটি। এই গাভীর রক্তের ফোটা থেকেই সর্বশেষ স্বর্ণযুগ নেমে আসবে পৃথিবীতে!

বার্লিন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক সেজেম ফ্রেডম্যান এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন— একটি প্রাণীর আকস্মিক জন্ম গোটা এক জাতিকে জাগিয়ে দিলো। এ আসলে ধর্মীয় ভাবনার নতুন তরঙ্গ, ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের অভিনব জাগরণ। ইহুদীরা একে নিয়ে ভাবছে আর বড় বেশি আবেগের সাথে এর বিষয়ে আলোচনা করছে (আস-সিয়াসাহ, ৩/১০/১৯৯৭) ইসরাঈলের এ গাভী নতুন এক মেহমান। এমন মেহমানকে শুধু ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, এমন নয়, বরং রাজনীতিকরা এ নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। তারা কতো বেশি এর চর্চা করতে পারে, এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। উদ্দেশ্য হলো জনগণের নিকট ধর্মপ্রাণ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করা ও রাজনৈতিক স্বার্থের পাখি শিকার। ফলে ইসরাঈলী রাজনীতিতে ধর্মব্যবসার নতুন করে জোয়ার সৃষ্টি হলো।

কিন্তু ইহুদীদের কোনো কোনো শ্রেণীর মধ্যে গাভীর এই ঘটনা কোনো ধরনের আনন্দ সৃষ্টি করতে পারেনি। এটি আসলে সেক্যুলার মহল। তারা গাভী বিষয়ক উৎসাহের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষতি প্রত্যক্ষ করছিলো। এবং উগ্রবাদী ইহুদীদের রাজনৈতিক বিজয়ের ব্যাপারে ভীত ছিলো। এ ছাড়া এ উদ্বেগও সৃষ্টি হয়েছিলো যে, ব্যাপকভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়লে ধর্মের ব্যাপারে কম আগ্রহীদের সাথে উগ্র ইহুদীদের দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। ফলে এ উগ্রবাদ মুসলমানদের বিপন্ন করবে তো ভালো কথা, সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন করবে ইহুদীদের সামাজিক সংহতিকেও। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ইসরাঈল, হাইকলের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈলী জাতীয় ঐক্যে চিড় ধরবে।

খুত ধরা পড়লো ঃ ইহুদীরা নিজেদের কল্পনা ও খেয়াল সমূহকে দুনিয়ার সামনে অপরিহার্যরূপে তুলে ধরার ব্যাপারে ওস্তাদ। ধর্মীয় উচ্ছ্বাসকে তীব্রতর করে তোলে দুনিয়াকে বৃহৎ কোনো পয়গাম শুনিয়ে দিতেই বোধ হয় মেলোডিকে পবিত্র লাল গাভী সাব্যস্থ করা হলো। ইসরাঈলী পত্রিকা মাআরিফ ১৯৯৭ সালের ২৯ অক্টোবর সংখ্যায় ধর্মীয় পুরোহিত শিমার ইয়ানুফের বক্তব্য প্রচারিত হয়। তিনি মিলেটি যে ফার্মে রয়েছে, সেটা পরিদর্শন করে এসে বলেন, সম্ভবত এই গাভী প্রকৃত লাল গাভী নয়। কেননা এর মধ্যে নানান অপূর্ণতা রয়েছে।

তিনি প্রধানমন্ত্রী রবিনকে অবহিত করে বলেন— গাভীটি আসলেই লাল গাভী নয়। কারণ তার গায়ে সাদা লোমও দেখা যাচ্ছে। নিখাদ লাল নয় এর পূরো দেহ। অন্য রঙের মিশ্রণও তার গায়ে রয়েছে।

শিমারের এই বক্তব্যকে অমূলক প্রমাণের জন্যে অন্য ইহুদী নেতারা তারপর তৎপর হয়ে উঠলো। অ্যামেজরুর পত্রিকায় ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ের ৯ তারিখে জায়োনিস্ট নেতা এহুদ অটোজোনের বিবৃতি প্রচারিত হয়। তিনি লিখেন— শিমারের উপলব্ধি ভুল। কারণ যে লোমগুলো নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তা অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর তা অদৃশ্য না হলেও অসুবিধা নেই। কেননা পবিত্র গ্রন্থে আছে অল্পস্বল্প লোমের ভিন্ন রঙ লাল গাভীর মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না।

গাভী বিষয়ে আমরা ঃ এই গাভী নিয়ে আমাদের বলবার, ভাববার, কিংবা আগ্রহী হবার কিছু নেই। এটা থাকা না থাকার মধ্যে কোনো তাৎপর্য নেই। এটার রঙ, আকার-আকৃতি সময় ও আত্মপ্রকাশ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ই নয়। তবে এই গাভীর হাম্বা রবের ভিতরে ইহুদী ষড়যন্ত্রের যে বিস্ফোরণ লুকিয়ে আছে, সেটা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। বিগত অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় ধরে ইহুদীদের যে বিষয়গুলোকে আমরা অহেতুক ও বাগাড়ম্বর হিসেবে প্রতিপন্ন করেছি,

ইহুদীরা সেগুলোকে বাস্তব বিষয় হিসেবে প্রমাণ করে ছেড়েছে। অতএব গাভীর বিষয়টি নিয়ে কিছুই হবার নয়, তা বলি না। ইহুদীরা যে যে গুণের কথা বলছে, যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার করছে, সব কিছুর আলোকেই যথার্থ গাভী তারা পেয়ে যেতে পারে। কর্তাদের হাতে এটা তুলে দিয়ে চূড়ান্ত কোনো এস্তেদরাজের প্রকাশ ঘটাতে পারেন আল্লাহ পাক। গাভী পেলে অবশ্যই ইহুদীরা নিজেদের পবিত্র করার সুযোগকে আলিঙ্গন করবে। তারপর পরিকল্পিত হাইকলকে দাড় করাতে নিজেরা দাঁড়িয়ে যাবে।

'খোদার বংশধরদের' নাপাকী ও গাভীর রক্ত ঃ মজার ব্যাপার হলো ইহুদীরা চিরকালই নিজেদেরকে আল্লাহর বংশধরও নির্বাচিত সম্প্রদায় বলে অহংকার ফলিয়ে থাকে অপরদিকে তাদের বিশ্বাস মতে বেশ কয়েক শো বছর ধরে তারা নাপাকীর গহীনে ডুবে আছে। এ থেকে তাদেরকে কেউই মুক্তি দিতে পারে না, গাভীর রক্ত ছাড়া। উপাসনার নামে যে সকল প্রথার চর্চা তারা হাইকলে করতো, হাইকল না থাকায় সেগুলো করা হচ্ছে না। ফলে তাদের নাপাকীর উপর আরো নাপাকীর স্তুপ বেড়ে চলছে। এই অবস্থা চলছে দুই হাজার বছর ধরে। এ সময়ে কোনো পবিত্র গাভীও মিলেনি। সুতরাং দুই হাজার বছর ধরে ইহুদীরা পঙ্কিলতার গহীনে হাবুডুবু খাচ্ছে, এটাই তাদের আকিদা।

তাওরাতের ভাষ্যমতে— কোনো দূর্গে কেউ মারা গেলে অন্য যারা দূর্গে ছিলো, সবাই নাপাক। যারা এতে প্রবেশ করবে, তারাও নাপাক। কাপড়ের ঢাকনা ছাড়া উন্মুক্ত প্রতিটি বরতন নাপাক। কোনো মৃত অথবা নিহত ব্যক্তির হাড় কিংবা কবরকে যে স্পর্শ করবে, সে নাপাক। অপবিত্র পানি স্পর্শ করা মাত্রই স্পর্শকারী নাপাক। আর নাপাক ব্যক্তি যাকে ছুয়ে ফেলবে, সেও নাপাক।' তাহলে ইহুদীরা কী বলতে পারবে আল্লাহর বংশধর দাবীকারী এই সম্প্রদায়ের ক'জন ব্যক্তি পবিত্র ? তাদের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য অনুযায়ী ইহুদীদের মধ্যে নাপাক নয়, এমন ব্যক্তি খোঁজে বের করা অসম্ভব।

তবে আমাদের কাছে বিষয়টি অন্য রকম। আমরা প্রতিটি কাফির-মুশরিককে জানি নাপাক হিসেবে। তবে ইহুদীদের আকিদার মজার দিকটি হলো তারা যতোই নাপাক হোক তাদের নাপাকী দূর হয়ে যাবে দ্বিতীয় সহস্রাব্দে লাল গাভীর রক্তের মহিমায়। ইহুদীদের এনসাইক্লোপেডিয়ার বক্তব্য হলো— লাল গাভীর ক্ষেত্রে করণীয় হলো একে কুদসের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। জবাই করার পরে তাকে পুরোপুরি ভস্ম করে দিতে হবে। এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন পুরোহিত কিংবা জ্যোতিষী। ছাইগুলো ব্যবহৃত হবে পবিত্রতা অর্জন ও নাপাক আত্মাদের অপচ্ছায়া দূর করার

জন্য। আপনজনের লাশ স্পর্শের ফলে ইহুদীদের মধ্যে যে নাপাকী এসেছে তা এভাবেই দূর হবে।'

ইহুদীদের জাতিগত নাপাকীর বিষয়টি খুবই জটিল। তাওরাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তালমুদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাপাকী থেকে পবিত্র হবার পদ্ধতি বর্ণনায় লিখা হয়— 'গাভীর রক্ত পবিত্রতা এনে দেবে। গাভীর রক্তেই সূচিত হবে ইহুদীদের মহান শাসনামল। কুয়েতের 'রাইসুল আলম' পত্রিকায় ইসরাঈলী বিভিন্ন পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯৯৮ এর ৫ই মার্চে লিখা হয়— ইসরাঈলের বড় এক পুরোহিত আলবুয়েমে নামীয় সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে চমকপ্রদ কিছু বক্তব্য রেখেছেন। ইহুদীদের লাল গাভী সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো— নাপাকীর মধ্যে ডুবে থাকা পাঁচ শো মিলিয়ন ইহুদীর জন্য একটি গাভীর রক্তই কি যথেষ্ট হয়ে যাবে ? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ কয়েক বছরের জন্য। তাওরাতের ভাষ্যমতে বুঝা যায় হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে প্রথম গাভী প্রেরিত হয়েছিলো এরপরে দ্বিতীয় হাইকলের সময়ে ৮টি গাভী আত্মপ্রকাশ করে। সব মিলিয়ে নয়টি হলো। আমরা আছি দশ নম্বর গাভীর যুগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গাভীর ব্যাপারটি ইহুদীদের কাছে সামান্য কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষ করে যখন তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, দুটি যুগ পূর্ণ করে নতুন এক গাভীর যুগে তারা পৌঁছে গেছে।

একথাও মনে রাখা চাই যে হাইকলে আদায়যোগ্য ৯৫ ভাগ ইবাদত ইহুদীরা মৃত ব্যক্তি স্পর্শজনিত নাপাকীর কারণে আদায় করতে পারছে না। কোনো কোনো পুরোহিতের মতে— অপবিত্র লোকদের কারণে ইবাদতের জন্য হাইকল উদ্বোধনই সম্ভব হবে না। আর পবিত্রতা তো গাভীর ছাই ব্যতিত অর্জিত হওয়া অসম্ভব। প্রশ্ন উঠেছে নাপাকীর কারণে ইহুদীরা যদি হাইকলে প্রবেশেরই অযোগ্য হয়, তাহলে এই নাপাকী সহকারে হাইকল বানালে সেটাও তো নাপাক হয়ে যাবে? কেননা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের ফয়সালা হলো নাপাক ব্যক্তি যা স্পর্শ করবে, তাও নাপাক। এ প্রশ্নের কী উত্তর ইহুদীরা দেবে, আল্লাহ মা'লুম।

ইহুদীরা চাচ্ছে যে কোন মূল্যে পবিত্র হতে। এ জন্য তারা কি পরিমাণ তৎপর তার আন্দাজ পাওয়া যাবে ইসরাঈলী পত্রিকা 'মার্টূস' এর ১৯৯৮ সালের ২রা মার্চে প্রকাশিত এক রিপোর্টে। সেখানে এক ইহুদী পুরোহিতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখা হয়— আমরা হাইকলের নির্ধারিত জায়গার সামনে পূর্বমুখী করে গাভী জ্বালাবো। এ কাজে বিভিন্ন বৃক্ষের কাঠ ব্যবহৃত হবে। তারপর ছাইকে পানি সরবরাহের মতো পাইপ

লাইনের সহায়তায় প্রতিটি ইহুদীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবো।' তাতেও কিন্তু সমস্যার সমাপ্তি ঘটছে না। যে সব ইহুদী ইসরাঈলের বাইরে আছে, তারা এটা কীভাবে হাসিল করবে?

সম্ভবত বোতলে ভরে সারা দুনিয়ায় ছাইয়ের সপ্লাই চলবে। নতুবা দুনিয়ার সব অঞ্চল থেকে ইহুদীরা ছাইয়ের জন্য ইসরাইলে জড়ো হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

জন্মের সময়, জবাইয়ের সময় ঃ

গাভী কখন জবাই হবে, এটা নির্ভরশীল কখন সে জন্মেছে, এর উপর। জন্মের তিন বছর পর জবাই — এটাই ইহুদীদের বিশ্বাস। কিন্তু যে গাভী নিয়ে তোলপাড় চলছে, এর জন্ম নিয়ে তো সৃষ্টি হয়েছে জোরালো এখতেলাফ। কেউ বলছে এটা জন্মেছে ১৯৯৭ এর আগস্টে, কারো মতে জানুয়ারীতে। এ হিসেবে গাভীটি জানুয়ারি ২০০০ এ অথবা ২০০০ সালের আগস্টে জবাই হবার কথা।

কিন্তু ২০০০ সাল গোজরে আরো বহু পানি গড়িয়ে গেলো, ইহুদীদের গাভী জবাই হলো না। সম্ভবত এরা একমত হতে পারছে না কোনো গাভী সম্পর্কেই। খোঁজে পাচ্ছে না দশম গাভীটি। কিন্তু গাভীর জন্য তারা মরিয়া। গাভীটি তাদের পেতেই হবে। পবিত্রতার জন্য, ইহুদী স্বর্ণযুগের জন্য।

জেরুসালেমে ইহুদী ডিনামাইট

তৃতীয় সংহস্রাব্দের প্রথম শতাব্দীতেই মনে হচ্ছে কুদস শহরে নতুন কাহিনী রচিত হবে। শহরটি আছে ইহুদীদের কব্জায়। এর সুরক্ষায় ক্ষেপণাস্ত্র তাক করে রেখেছে দুনিয়ার খ্রিস্টানরা। এ শহর থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে সেক্যুলার আরবরা। এই হচ্ছে আজকের কুদস। কিন্তু সামনে যে কাহিনীটি তার উৎস নিহিত আছে সহস্রাব্দ সম্পর্কে ইহুদী চিন্তাধারার গভীরে। ইহুদীরা প্রচার করছে, জেরুসালেমই তাদের সাম্রাজ্যের যথার্থ রাজধানী। এক্ষেত্রে অন্য কারো নাক গলানোকে তারা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

খ্রিস্টানদের এ্যাংলিকান সংগঠনগুলো আমেরিকান কংগ্রেসের কাছে দাবী তুলেছিলো ২০০০ সালের সমাপ্তির পূর্বেই যেনো জেরুসালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরিত করা হয়। আমেরিকা কিছুটা বিলম্বে হলেও সেই দাবী পূরণ করেছে। এতে করে জেরুসালেমের ইহুদী রাজধানী হবার পক্ষে বলিষ্ঠ এক সমর্থক মিলে গেলো। জেরুসালেমে ইহুদী একচেটিয়াবাজীর পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় সহস্রাব্দে এ শহরের সর্বশেষ পরিণতি কোন দিকে গড়াবে এটা অবশ্যই দেখার বিষয়। কেননা জেরুসালেমের ব্যাপারে কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার দাবী পরিত্যাগ করতে পারে না।

তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দশকে ইহুদী স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি হ্যাঁ, অথবা না, স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই হ্যাঁ, অথবা না পরিস্ফুট হবে বিভিন্ন উপায় উপকরণের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চালিকাশক্তির সংশ্লিষ্টতায়। এ কারণেই জেরুসালেম আমাদের সম্মুখে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে, যে প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে অনেক কিছুই। প্রশ্ন হলো— ইহুদীদের কাছে জেরুসালেমের তাৎপর্য কী? তারা বিগত পঞ্চাশ বছরে এর জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে? খ্রিস্টানদের কাছেই বা আল-কুদসের কী তাৎপর্য? আল-কুদস সম্পর্কে বিগত পঞ্চাশ বছরে তারা কী ভূমিকা নিয়েছে? অপরদিকে মুসলমানদের কাছে শহরটির গুরুত্ব কতটুকু? বিগত পঞ্চাশ বছরে এই শহরকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা কী তৎপরতা চালিয়েছে?

ইহুদীদের কাছে আল-কুদস ঃ

ইহুদীরা কুদস শহরকে ইউর শলায়েম বা উর শলিম বলে থাকে। এর অর্থ হলো নিরাপত্তার শহর। এ শহরে শান্তির শাহানশাহ এসে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, এ কারণে শহরটির এই নাম। তওরাতে এর আলোচনা এসেছে বিপুলভাবে। অন্যূন ছয় শো আশি জায়গায় এর উল্লেখ রয়েছে। এই কুদসের নিকটে অবস্থিত

সহয়ুন পাহাড়ের নামে কুদসকে ইহুদীরা সহয়ুনও বলে থাকে এবং এ কারণেই ইহুদীবাদী আন্দোলনের নাম সহয়ুনী আন্দোলন। তাওরাতের ভাষায় এটি হলো খোদার শহর, ন্যায়ের শহর, নির্বাচিত সম্প্রদায়ের শহর, আরয়ীল তথা খোদার বাঘ। এ সমস্ত বিশেষণের মৌলিক এক উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটি হলো ইহুদী আকিদা ও বিধি-বিধানে একে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত করে রাখা। ইহুদী শরীয়ত তাদের উপর বছরে তিনবার এই শহর পরিদর্শনকে ফরজ করেছে। ফরজ করেছে এর প্রতি রোখ করাকে।

তিন হাজার বছর আগে এই শহর ইহুদীরা নিয়ন্ত্রণ করতো। তাদের আকিদা ছিলো ঈসা (আঃ)-এর আগমনের এক হাজার বছর পূর্বে দাউদ (আঃ) এ শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই শহর অতএব একান্তই তাদের। এমতাবস্থায় এ শহরকে মুসলমানরা নিজেদের রাজধানী বানাবে কোনো ইহুদীর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব? অথবা এ শহরকে ইহুদী বনাম মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে, তাইবা কীভাবে তারা মানতে পারে? যে সকল আরব মনে করেন এ শহরকে বণ্টন করার প্রস্তাব ইহুদীরা কবুল করে নেবে এবং পশ্চিমাংশ নিজেরা নিয়ে পূর্বাংশ মুসলমানদের দিয়ে দেবে, তারা হয় দিবা স্বপ্নের রাজ্য হাতড়াচ্ছেন অথবা বিভ্রান্তির পানি সাঁতরাচ্ছেন।

ইহুদীরা এ শহরকে চূড়ান্তভাবে অবিচ্ছিন্ন হিসেবে জানে। এর আয়তনে বৃদ্ধিই কেবল ঘটতে পারে, কোনো প্রকার হ্রাস ঘটা অসম্ভব। তালমুদে আছে— শেষ জামানায় কুদস শহর বড় হতে হতে দামেশক পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং এ শহর থেকে নির্বাসিত লোকেরা তাদের তাবুগুলোকে দেখতে পাবে শহরের সাথে মিশে গেছে। ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেনইয়াহু ইসরাঈলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছিলেন— আমরা জেরুসালেমের সীমানা সম্প্রসারণ করতে চাই। ১৯৯৯ সালে ১৬ই মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ এসেছে ইহুদীদের ধর্মীয় বর্ণনা মতে কুদস শহর বিশেষ এক মর্যাদা রাখে। এ শহর মুক্তিদাতা মসীহের সাম্রাজ্যের রাজধানী হবে। যিনি দাউদ (আঃ) এর বংশধর। তাকে শাখিনাহ বলা হয়। শাখিনাহ মানে ঐ সম্রাট, যার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মানুষ মুক্তি অর্জন করবে। তালমুদের কিচ্ছা কাহিনী ও কিংবদন্তি বিষয়ক অধ্যায় আজাওয়ায় লিখা হয়েছে— ইহুদীরা অচিরেই কুদসে আসবে। তারা এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। এবং তাদের সীমানাগুলো সম্পদে ভর্তি হয়ে যাবে। তওরাতের ব্যাখ্যায় এর বাতেনী ভাষ্যকার কুবালা লিখেছেন— কুদস এমন জায়গা, যা আসমানী সম্পদে ভরপুর। এখানেই দুনিয়ার সকল সম্পদ জমা হবে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো কুবালার হেদায়েতের আলোকে ইহুদীরা এই বিধান

প্রণয়ন করেছে যে— কুদসের সীমানাকে কেবলই সম্প্রসারিত করতে হবে। যাতে অন্ধকারের সৈন্যরা চাইলেই শহরে ঢুকতে না পারে। ইহুদীরা পরিকল্পিত বিশ্বসাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে একে পেতে বদ্ধপরিকর। অতএব এখানে আর কারো জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়ার কথা তাদের পক্ষে ভাবাই অসম্ভব।

জেরুসালেম রাজধানী, নতুবা ইসরাঈল অর্থহীন

ইহুদীরা প্রতিটি পদক্ষেপেই নিজেদের আকিদার সুরক্ষা ও এর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য রেখে চলে। কুদস শহরের সাথে সম্পর্কিত আকিদার ভিত্তিতে একে আগাগোড়া 'ইহুদী' বানানো প্রতিটি ইহুদী শক্তির উদ্দেশ্য। তেল আবিবকে অস্থায়ী রাজধানী বানাবার পূর্বেই ইহুদীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে বায়তুল মোকাদ্দাসকে রাজধানী করে ফেলার। ১৯৪৮ সালে ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই শহরটিকে ইহুদীকরণের প্রচেষ্টায় তারা নিয়োজিত।

বেনগোরিন এবং তারপরে মোনায়েম বেগিনের শ্লোগান ছিলো— কুদস ছাড়া ইসরাঈল অর্থহীন আর হাইকল ছাড়া কুদসের কোনোই মূল্য নেই। ইহুদীরা ইয়াকুব তথা ইসরাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের জন্য সাম্রাজ্য গড়বে, আর তার রাজধানী হবে না দাউদের (আঃ) শহর আল কুদস— এতো হতে পারে না। আর দাউদের (আঃ) শহরেরই কী অর্থ থাকে যদি তাতে না থাকে সোলাইমানের (আঃ) গড়া উপাসনালয়? এই উপাসনাগারের উপরেই তো নির্ভরশীল ইহুদীদের যাবতীয় উপাসনা ও ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা।

ইহুদীদের সেক্যুলার নেতৃবৃন্দ হয়তো এ বিষয়টা নাও বুঝতে পারে। তারা ধর্মীয় ইতিহাসের গভীর তলাদেশ ছুঁতে পারবে না। এ কারণেই বাতাসে সিঁড়ি নির্মাণ করে উপরে উঠতে চায়। মিথ্যা শান্তিকর আওয়াজ তুলে লক্ষ্য পুরণ করতে চায়। ওরা আসলে কাপুরুষ ইহুদী রক্তের দুঃসাহস থেকে বঞ্চিত।

জেরুসালেম জবরদখল

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ইহুদীরা পশ্চিম জেরুসালেম দখল করে এবং এ অঞ্চলে ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণের পক্ষে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ করায়। এরপর পূর্বজেরুসালেমের দিকে মনোযোগ দেয়। অতঃপর যুদ্ধ হলো। আরবরা হারলো। ইহুদীরা পূর্বজেরুসালেমকে নিজেদের করে নিলো। কিন্তু এর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পক্ষে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়নি। বরং একে ঘোষণা করলো দখলিকৃত এলাকা হিসেবে। তবে দখল প্রত্যাহারে কেউই ইসরাঈলকে চাপ দিলো না। তলে তলে সবাই জবর

দখলকে মেনে নিলো। পূর্ব জেরুসালেমে দখল প্রতিষ্ঠার বিশ দিন পর ইহুদী রাষ্ট্র এ অঞ্চলকে নিজেদের রাজ্যভুক্ত বলে আইন পাশ করলো। এই আইনের নাম রাখা হলো গ্রেট কুদস প্রজেক্ট!

পূর্ব-জেরুসালেম দখলের পর সেখানে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিলো ইহুদীরা। প্রথম দিকে তো গোটা এলাকাই মুসলিম এলাকা ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কিছু বদলে যেতে লাগলো। ১৯৬৭ সালে জেরুসালেমে বসবাসকারীদের এক শো ভাগই ছিলো ফিলিস্তিনী। কিন্তু সেই সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পেতে লাগলো। জেরুসালেমকে এক বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে পশ্চিমে তেল-আবিবের দিকে প্রশস্ত করা হলো। দক্ষিণ দিকে খলিল শহর, উত্তর দিকে রামাল্লা ও পূর্বদিকে আরঞ্জা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হলো। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে পূর্ব জেরুসালেমের তিন চতুর্থাংশ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এক আশংকার সাইরেন বেঝে উঠলো। ইহুদীরা ষাট হাজার ফিলিস্তিনীকে ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করলো। তাদের সব কিছু দখল করে নিলো। দখলিকৃত গোটা ফিলিস্তিনকে ইহুদীরা নিজেদের এলাকার সাথে মিলিয়ে নিলো। এমনকি নব্বইয়ের দশকে ফিলিস্তিনীদের অধিকারে ছিলো শহরের ২১ শতাংশ ভূমি। কিন্তু সেখানে অধিকার বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠায় তারা সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে লাগলো। পরিণতিতে বিগত শতকের শেষ দশকে ফিলিস্তিনীদের অধিকারে থাকলো মাত্র ৪ শতাংশ ভূমি।

অপরদিকে পূর্ব জেরুসালেমে বড়ো উদ্দীপনার সাথে ইহুদী বসতি নির্মাণ চলছিলো। বিশেষ করে শেনইয়াহুর সময়ে তা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে। তিনি জেরুসালেমের উপকণ্ঠে গিট প্রজেক্টের ২৬ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। এই প্রজেক্ট শুরু হয়েছিলো শ্যারনের হাত দিয়ে। শামীরের শাসনামলে ইহুদী কলোনি দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার লক্ষে এই প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়।

ইহুদীবাদী রাষ্ট্র, ইহুদীবাদী নেতা ঃ ইহুদীবাদী রাষ্ট্রের রাজধানী এক দিক দিয়ে ধর্মীয়, অপরকি দিয়ে সেক্যুলার এমন নয়। বরং একক ও একচ্ছত্রভাবে সেটা ধর্মীয়। এটা রাজধানী হয়েছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই। এ কারণেই জেরুসালেমে ইহুদী রাজধানীর ধর্মীয় তাৎপর্য নিয়ে কোথাও কোনো টু শব্দ শুনা যায় না। সেক্যুলার ইহুদীদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারাও এতে মার খায় না। ধর্মীয় ভাবাবেগের স্রোতে তারা যখন জাতকূল খুইয়ে 'নাই' হয়ে যান, সেটাকে তখন আর দেখতে দেখতে অস্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু আরব সেক্যুলারদের একটি ঘোড়া রোগ বেশ অস্বাভাবিক ঠেকে। তারা আশা করেন ইহুদী সেক্যুলাররা শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় উগ্রবাদ থেকে এ শহরকে মুক্ত করবে!

ইহুদীরা জেরুসালেম শাসন করছে তাদেরই ধর্মীয় এক নিয়মের ছায়া অনুসরণ করে। যার রূপরেখা প্রণয়ন করেছে উগ্রবাদী নেতৃবৃন্দ, পুরোহিত, জ্যোতিষী ও ইহুদী ধর্মপন্ডিতরা। একে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছে রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্বশীলদের উপর।

শেনইয়াহু তার সরকারের কোয়ালিশনে শরীক দলগুলোকে বলেছিলেন— আমি ধর্মীয় প্রক্রিয়া ও বসতি নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই। প্রয়োজনে গোটা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। কিন্তু তাওরাতের নির্দেশে এ শহরকে ইহুদী শহর বানাবোই। এ শহরকে মুক্ত করবো অন্য সব কিছু থেকে। আমার স্বপ্ন হলো জেরুসালেমের পুনর্গঠন। আমি চাই নতুন ইহুদী বসতি দ্বারা একে পরিপূর্ণ করে দিতে। (বেদিয়েউত আহরণের ৮/৬/১৯৯৭)

বুঝাই যাচ্ছে শেনইয়াহুর উদ্দেশ্য পূর্বজেরুসালেম। কারণ পশ্চিম জেরুসালেম তো ইহুদী বসতিতে এমনিতেই ছেয়ে আছে। আসল ব্যাপার হলো শেনইয়াহুর অনেক আগেই ধর্মবাদী ইহুদীদের দিয়ে শহর ভর্তি করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তবে শেনইয়াহু এ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনে দেন। একে এগিয়ে নিয়ে যান সাফল্যের দিকে।

সে বছরের ২৪শে জুন পার্লামেন্টে বেনগুরিন ঘোষণা করেছিলেন— কুদস শহরকে ইসরাঈলী রাজধানী করাটাই সময়ের অগ্রাধিকার। ১৯৫০ সালের ২৩ শে জানুয়ারি ইহুদীরা ঘোষণা করলো, কুদসই হবে ইসরাঈলের রাজধানী। ইসরাঈল তার প্রশাসনিক সমস্ত দপ্তর পশ্চিম কুদসে স্থানান্তরিত করলো। আর প্রচেষ্টা চললো পূর্ব কুদসকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য। ১৯৬৭ সালের জুনে শুরু হলো যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরুর দুদিনের মধ্যে সমস্ত আরব বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ইহুদী সৈন্যরা পূর্ব কুদসে প্রবেশ করে। তারপর তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দাইয়ান গিরিয়া দেয়ালের সামনে দাড়িয়ে ঘোষণা করলেন— আমরা দ্বিতীয়বার নিজেদের পবিত্র শহরের নিয়ন্ত্রণ বুঝে নিলাম। যে পবিত্র ভূমি আমাদের রাজ্যের অংশ হয়ে গেলো, তা কখনো আমাদের থেকে আর বিচ্ছিন্ন হবে না।

এই ঘোষণা শুধু যুদ্ধপরিস্থিতির উত্তেজনাকর প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বরং কাসাব্লাংকার আন্তর্জাতিক শান্তি কনফারেন্সে রবিন বলেছিলেন— পূর্ব-পশ্চিম অংশ মিলেই অবিচ্ছিন্ন কুদস। এটাই চিরদিনের জন্য ইহুদী রাজধানী। (হায়া সোফিয়া ১২/১১/১৯৯৪) শেনইয়াহুর মতে কুদসের ব্যাপারটা নিছক রাজনৈতিক কিংবা স্বাভাবিক অর্থে ধর্মীয় নয়, বরং এ হচ্ছে ইহুদীদের জীবন-মরণের ব্যাপার। তিনি ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আমেরিকা সফরকালে আমেরিকার পার্লামেন্টে

কোনো অঙ্গীকারনামা পাঠ করার মতো অথবা শুনিয়ে দেয়ার মতো করে বারবার বলে চলছিলেন—

জেরুসালেম চিরকালের জন্যই ইসরাঈলের রাজধানী

জেরুসালেম চিরকালের জন্যই ইসরাইরের রাজধানী॥

প্রতিবারই কথাটি উচ্চারণে শেনইয়াহুর আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিলো। আর কংগ্রেস সদস্যদের করতালিতে পার্লামেন্ট এতোটাই মুখর হয়ে উঠছিলো যে মাইকের আওয়াজই শুনা যাচ্ছিলো না। তারপর তার সম্মানার্থে পার্লামেন্ট সদস্যরা দাঁড়ালেন এবং তাদের জোশ তুঙ্গ আকার ধারণ করলো। শেনইয়াহু হোওয়াইট হাউসে ক্লিনটনের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন— কুদসের ইহুদী বসতি নিয়ে কোনো কথাই শুনব না।

এহুদ বারাক নির্বাচনে জয়ী হয়ে ঘোষণা দিলেন— কুদসই ইহুদীদের একক রাজধানী। চিরকালীন রাজধানী। তার জয় লাভের কিছু দিনের মধ্যেই কুদস শহরে ইহুদী বসতি নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হলো বিপুল উচ্ছ্বাসে। সেই উচ্ছ্বাসে যোগ দিলো আমেরিকাও। এহুদ বারাক ওয়াশিংটন সফরে যাবার আগেই মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিটন ঘোষণা করলেন— জেরুসালেমকে স্থায়ী রাজধানী হিসেবে পাওয়া ইসরাঈলের অধিকার। ফলত কুদস বিষয়ে ইহুদীদের মধ্যে দ্বিধা-সংসয়ের কিছুই থাকলো না।

১৯৯৫ সালের ৬ আগস্টের হার্টস পত্রিকা লিখেছিলো— লেবার পার্টি সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় জেরুসালেমে উগ্রপন্থী ইহুদীদের জন্য ১ লাখ ২০ হাজার এপার্টমেন্টের বসতি তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছিলো। এর মধ্যে সাড়ে ছয় হাজার এপার্টমেন্ট জেরুসালেমের উপকণ্ঠে অবস্থিত। আসলে বসতি নির্মাণের এ প্রক্রিয়া সামরিক কর্মপরিকল্পনারই অংশ। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যুদ্ধবাজ প্রতিরক্ষামন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের হাতে পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা তুলে দেয়ার মাধ্যমে।

বসতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় উন্মাদনার তীব্রতা ইসরাইলে এতোটাই লক্ষ্যণীয় যে ফরাসী পত্রিকা বেজারুয় ১৯৯৭ সালের ১৬ই জুনে প্রকাশিত 'জেরুসালেমে আসল হামলা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখা হয়— উগ্র ইহুদী, ধর্মীয় সংগঠন ও পুরোহিতদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কুদস শহরের প্রতিটি বসতিতে তাওরাতে বর্ণিত শিক্ষার শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ জোর গতিতে এগিয়ে চলছে। পত্রিকাটি আরোও লিখে— উগ্র ইহুদীরা শহরে খুবই প্রভাবশালী হয়ে উঠার লক্ষণসমূহ একের পর এক প্রকাশ পাচ্ছে। ইতোমধ্যে তাওরাতের বিধানের নামে শনিবারে সরকারী বিভিন্ন অফিস-আদালত বন্ধের দাবিতে তারা সফল হয়েছে। শনিবারে তারা চায় ধর্মীয় কাজ ছাড়া

অন্য কিছুই যেনো না হয়। এটাই তাওরাতের কথা। সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ লক্ষ্য করা গেছে।

এই সব লোক ইহুদীবাদীদের নিকট থেকে বড় বড় অঙ্কের চাঁদা আদায় করছে। সরকারী সহযোগিতার দ্বার তাদের জন্য অবারিত। তাদের কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স গ্রহণ করা হয় না। সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও তাদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। মিউনিসিপ্যালিটি তাদের জন্য ১১টি প্লট বরাদ্দ করেছে। এগুলোর মধ্যে তারা ৮৭টি উপাসনালয় বানিয়েছে। ১৯৯৬ এর ৯ই মে নিউজ উইক পত্রিকা লিখে— জেরুসালেম ইহুদী চরমপন্থীদের ঘাটিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মের প্রতি কম উৎসাহী সাধারণ ইহুদীরা শহর ছাড়ছে। রাজনৈতিকভাবে উগ্রবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাধারণ ইহুদীদের জন্যে শহরে অবস্থান দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। জেরুসালেম ছাড়া অন্যান্য এলাকায়ও ইহুদীদের ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে। কুদস শহরের হিব্র ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ— 'ইসরাঈল ২০০০' এ লিখা আছে– ১৯৯২ পর্যন্ত ইসরাইলে ধর্মীয় আবেগে উদ্দীপ্ত লোকদের সংখ্যা ছিলো ৫৮ শতাংশ। গ্রন্থলেখক এই আশংকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে ধর্মীয় জোশে উত্তপ্ত শক্তিগুলো অন্যসব প্রভাবশালী শক্তিকে হটিয়ে অচিরেই প্রধান শক্তি হয়ে উঠবে। নতুন বসতিতে বসবাসকারী ইহুদী যুবকরা বিদ্যমান অবস্থাকে ধর্মীয় আবেগ দ্বারা পাল্টে দিতে চাইছে। ফলে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব অন্য সব সংগঠনের উপরও পড়ছে। এতে আশঙ্কা হচ্ছে ইসরাঈলের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোটাই পাল্টে যাবে। ধর্মীয় উগ্রবাদীরা শেনইয়াহু সরকারের ৭টি মন্ত্রীত্ব লাভ করেছিলো। এহুদ বারাক সরকারের পরবর্তী নির্বাচনে তারা অর্জন করেছিলো দ্বিতীয় স্থান। তাদের কর্মসূচী হলো ইহুদী ধর্মীয় ব্যবস্থার অধীনে সমাজ রাষ্ট্র সবকিছু ঢেলে সাজানো। শনিবারে সব ধরনের অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ সব কিছু বন্ধ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ। তারা হাইফা, তেলআবিব ইত্যাদির রাজপথ ট্রাফিকের জন্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছে। অনুরূপভাবে লুদ বিমানবন্দরে বন্ধ করিয়েছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট। পার্লামেন্টের মহিলা সদস্য কিংবা প্রশাসনে কর্মরত মহিলাদের প্যান্ট-শার্ট ইত্যাদি পরিধানকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। ইসরাইল প্রশাসন এই উগ্রবাদীদের উদ্দীপিত করছে নানাভাবে। সরকার চাচ্ছে তারা যেনো নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। আনুমানিক ৬০ শতাংশ উগ্র ইহুদী সরকারী কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে না। তাদের দায়িত্বহীনতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়। অপরদিকে ২১ শতাংশ সেক্যুলার সরকারের আনুকূল্য পায় চাকুরি না করেও। এক

মৌলবাদী ছাত্রের পিছনে সরকার খরচ করে ১ লাখ ১৬ হাজার শাইকল। অপরদিকে সেক্যুলার ছাত্রের পিছনে খরচ করে তিন হাজার ছয় শো শাইকল। ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ৬২ শতাংশ মৌলবাদীকে ছাড় দেয়া হয়। অপরদিকে মাত্র ১০ ভাগ সেক্যুলার এই সুবিধা পাচ্ছে। (আল-হায়াত, ২১/২/১৯৯৯)

নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য সেক্যুলার আদালতের রায়ের বিপরীতে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থোডক্স ইহুদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নিজেদের পুরো ধর্মীয় লেবাসে আবৃত করে কালো মেঘমালার মতো তারা আচ্ছন্ন করে ফেলে ইসরাঈলের রাজনৈতিক আকাশ। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার পিছনের কারণ হলো ইসরাঈলের সুপ্রিম কোর্ট শনিবারে কয়েকটি ব্যবসাঠিক প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দিয়েছিলো। এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় উগ্রবাদীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। সাথে সাথেই টগবগে কড়াইয়ের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠলো গোটা দেশ। এই হচ্ছে ইসরাঈল। পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র আছে, সেখানে উগ্রবাদীদের এতোটা দৌরাত্ম বরদাশত করা হয়?

ইসরাঈল, বিশেষতঃ জেরুসালেমে এই উগ্র চন্ড রাজনীতির ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মনে হচ্ছে যে কোন সময় উগ্র ইহুদী বনাম সেক্যুলারদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। মাআরিফ পত্রিকায় ১৯৯৬ সালের ১৪ই জুলাইয়ের মন্তব্য প্রতিবেদনে লিখা হয় 'অবস্থা যদি এমনই চলতে থাকে তাহলে সেক্যুলার কেউ জেরুসালেমে বসবাস করতে চাইবে না। অচিরেই সামাজিক সংহতি বলতে কিছুই আর বিদ্যমান থাকছে না। পায়ের তলার সবগুলো পাটাতন বিধ্বস্ত হতে চলছে।' সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ইউসে মাসারিদ এই ভীতির উল্লেখ করে বলেন— সেক্যুলার জনগণ উগ্রধর্মবাদীদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে নানাভাবে। সিভিল সোসাইটির সদস্যদের এক ইন্সটিটিউটের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ইসরাঈলের অর্ধেক বসতিতে উগ্রবাদী বনাম সেক্যুলারদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী অবস্থা বিরাজ করছে (হাল্লুইয়্যা, ২৩/১২/১৯৯৬) উগ্র ধর্মীবাদীদের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইহুদী প্রশাসন অসচেতন নয় বটে। কিন্তু সে সম্ভবতঃ জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের মোকাবিলার জন্যই এই সব চরমপন্থী তৎপরতাকে সহায়তা করছে।

১৯৯৭ এর ১৭ জানুয়ারির হায়ারলেস পত্রিকায় লিখা এক প্রবন্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ লিখেছেন— মধ্যপ্রাচ্য এখন বিপজ্জনক এক খাদের কিনারায়। কোনো কিছুই তার আগের অবস্থায় নেই। দ্রুতই পাল্টে যাচ্ছে সব কিছু। এমতাবস্থায় হয়তো আমাদের এগিয়ে যেতে হবে নিরাপত্তার দিকে। যে

নিরাপত্তার চাতালে দাঁড়িয়ে নতুন অর্থনৈতিক জগতের মুখোমুখি আমরা হবো। নতুবা ইহুদী মৌলবাদ ও চরমপন্থীর সহায়তার সামনে এগুতে হবে। তখন দরকার নতুন যুদ্ধাস্ত্রের। আমি ধর্মবাদী আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। এই প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চতুর্দিকে। ইসলামী মৌলবাদ তিন শো মিলিয়ন নারী-পুরুষের সহায়তা পাচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে আশংকাজনক' পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের পিছনে কোনো যুক্তি নেই। এর সাথে সম্পর্ক নেই কোনো সুস্থচিন্তার। বরং কিচ্ছা-কাহিনী নানান উপাখ্যান, জান্নাতের নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির উপর ভর করেই ইসলামী মৌলবাদ বিকশিত হচ্ছে। সংগঠিত মুসলিম শক্তির সহায়তায় এই মৌলবাদ থেকেই জন্ম নিয়েছে দুনিয়াকে আতংকিত করে তোলা বিভিন্ন সংগঠন। এই মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে নানান দেশে মুসলিম সরকার। অতএব আমরা চাই বা না চাই, এর প্রতিরোধে বাধ্য হয়ে মোকাবেলার পথ আমাদের বেছে নিতে হচ্ছে।' তিনি আরো লিখেন— ২০০০ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন ধরনের মিসাইল ও অস্বাভাবিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। এখন নতুন অস্ত্র এসেছে– উগ্রবাদ। এটি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন যুদ্ধের জ্বালানি সরবরাহ করছে। এ ছাড়া ২০০০ সাল পর্যন্ত দুনিয়ার নেতৃত্ব এক মেরু কেন্দ্রীক না থেকে সেখানে বহুমাত্রিকতা আসবে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উঠবে শক্তি পরীক্ষার এক প্রশস্ত ময়দান।'

১৯৯৬ সালের ২২শে নভেম্বর হার্টেস পত্রিকা বেঞ্জামিন শেনইয়াহুর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। পত্রিকার পক্ষ থেকে শেনইয়াহুকে প্রশ্ন করা হয়— এই মুহূর্তে ইসরাঈলের সবচে বড় হুমকি কি? তিনি বলেন— নতুন শতাব্দীতে পৃথিবীতে বিভিন্ন পরাশক্তি মাথা তুলে দাঁড়াবে। বিশ্ব রাজনীতি অস্থির হয়ে উঠবে। ফলে আমরা দুটি হুমকির মুখে পড়বো। একটি হুমকি আসবে ফিলিস্তিন থেকে আরেকটি আসবে ফিলিস্তিনের বাইরের বিভিন্ন ইসলামী শক্তি থেকে। ফিলিস্তিন থেকে যে হুমকি আসবে, এর সমাধান সহজ।

তারা স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নের সেই ঘোর থেকে তদের মুক্ত করলেই চলবে। কিন্তু দ্বিতীয় হুমকির প্রতিরোধ সহজ নয়। এটা ইসরাঈলের আওতার বাইরে। তবে আমার আশা-ইসরাঈল অচিরেই বিপুল শক্তিতে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। হয়ে উঠবে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য এক বৃহৎ শক্তি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উগ্রবাদের পৃষ্ঠপোষক শেনইয়াহু সেক্যুলারদের ভয় পাচ্ছেন না। তিনি ভয় পাচ্ছেন ফিলিস্তিনী মুক্তিকামীদের। ভয় পাচ্ছেন বিভিন্ন দেশের ইসলামী মুজাহিদদের। এদের জন্যই ইসরাঈল উচ্চতর প্রযুক্তি ও ব্যাপক

ধ্বংসাত্মক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে। উগ্র ইহুদীদের প্রস্তুত রাখছে মানবঢাল হিসেবে। এবং জরুেসালেমে তাদের শক্ত ঘাটি তৈরির মাধ্যমে আসলে এক প্রকার প্রতিরোধ দেয়াল তৈরি করে রেখেছে। আসল সময়ে যা কাজে আসবে।

আমাদের বিশ্বাস— দুনিয়ার নানান অঞ্চল থেকে যে ইহুদীরা আল-কুদস ও এর আশপাশে জড়ো হচ্ছে, তারাই এই সংঘাত ও যুদ্ধাগ্নির জ্বালানি, যে যুদ্ধ ইহুদী ও মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে সংগঠিত হবে। হুজুর (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী এ বিষয়ে আমাদের জানিয়ে দেয— আমার উম্মতের মুজাহিদরা দামেশকের ফটক সমূহ, তার আশপাশ এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের ফটক সমূহ ও এর আশপাশে যুদ্ধ করবে। শত্রুরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। হক অবলম্বন করে তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রবেন।

এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া বায়তুল-মোকাদ্দাসের দরোজাসমূহে লড়াইয়ে অংশ নেবে আরেকটি সম্প্রদায়। সেটা হলো খ্রিস্টিয় মৌলবাদ। এরা খোলা পায়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করছে এবং নিজেদের স্বগোত্রীয়দের বায়তুল-মোকাদ্দাসে জড়ো হবার দা'ওয়াত দিচ্ছে। এখানেই ইসা (আঃ) এর জন্ম হয়েছে। এখানেই তিনি তাশরিফ আনবেন। অতএব এই ভূমিতে মুসলমানদের কোনো অধিকার থাকতে পারে না। খ্রিস্টানদের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এই দাবীই উচ্চারণ করতে চায়।

বায়তুল-মোকাদ্দাস কেবলই খ্রিস্টানদের। ইহুদীরাও এখানকার কেউ নয়। হ্যাঁ তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গে থাকবে। এ সৌভাগ্য তাদের হবে। কারণ ঈসা মসীহের (আঃ) হাতে তারা পবিত্র হবে। এটাই বাইবেলের সিদ্ধান্ত। তারা তখন খ্রিস্টান হয়ে যাবে। তৃতীয় সহস্রাব্দ নিয়ে শোরগোল তুলে দুনিয়া মাত করছে এই পক্ষ। খ্রিস্টিয় মৌলবাদ। 'বেথেলহেম ২০০'শ্লোগান তুলে তারা তৃতীয় সহস্রাব্দের সংঘাতের দিকে মার্চ পাস্ট করে এগুচ্ছে।

মসীহের জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা

'আমি হৃদয়ের গভীর থেকে এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, মহাপ্রভু তোমাদের ও আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। যাতে আমরা দুনিয়ার রাজাধিরাজের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি।' আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড রিগ্যান সংক্ষিপ্ত এই উক্তির মাধ্যমে যে বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, তা আসলে বিপুল সংখ্যক পশ্চিমা নেতার মূল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ। রিগ্যান এই বক্তব্য দিয়েছিলেন ১৯৮৫ সালে, হোয়াইট হাউসের এক মিটিংয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মযাজক সোগার্ট, জেরি ফ্যালওয়েল, জিমি বিক্রে, মাইক উইথজ, প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ইহুদী নেতারা। যারা মূলত বিভিন্ন লবির মাধ্যমে আমেরিকার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। (আন নবুওত ওয়াস নিয়াসত ১৯২ পৃ.) ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নেতৃবৃন্দ মূলত প্রতীক্ষিত নবীর আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ। এ ব্যাপারে অধিকাংশ নেতাই সচেতন। যে সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ডোনাল্ড রিগ্যানের সেই উক্তিতে। উক্তিটি যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টের না হয়ে কোনো পাদ্রী বা বিশপের মুখ থেকে বের হতো আমরা বিস্মিত হতাম না। কথাটি বলেছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি দুনিয়ার বৃহত্তম সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিগত এক শতাব্দী ধরে দুনিয়ার রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই বিশ্বাস পোষণকারী নেতৃবৃন্দের দ্বারা।

তবে রিগ্যান যে মসীহের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চান, তিনি খ্রিস্টানদের মসীহ। রিগ্যানকে যে ইহুদীরা ক্ষমতায় বসিয়েছে, তারা কিন্তু অন্য এক মসীহের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। কারণ ইহুদীদের মসীহ আর খ্রিস্টানদের মসীহ এক নন।

ইহুদী-খ্রিস্টান উভয়েই বিশ্বাস করে এক প্রতীক্ষিত পুরুষের আগমন নিকটবর্তী। এজন্যে প্রস্তুতি আবশ্যক। উভয়েই সহস্রাব্দ বিষয়ে মিলেনারিয়ানিজমের বিশ্বাস পোষণ করে। এ বিশ্বাসের সারকথা হলো প্রত্যেক সহস্রাব্দ শেষে দুনিয়ায় বিশাল বিশাল ঘটনা ঘটতে থাকে। ঘটনাগুলো ঘটে ধারাবাহিকভাবে। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ পর্যায়ে সহস্রাব্দের সম্রাটের আগমন ঘটবে। বহু বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার পর পৃথিবীতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই শান্তি ফিরে আসবে।

ইহুদীরা মনে করে, মসীহের আগমন ঘটবে শনিবারে। এ দিন দুনিয়া সৃষ্টির সপ্তম দিন। ইমানুয়েল হাইমান লিখেন— আমরা মসীহের আগমন পূর্ববর্তি ফিতনার মধ্যে রয়েছি। (জায়োনিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম ৯১) খ্রিস্টানদের মধ্যেও তাওরাত থেকে এ বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তি লগ্নে

মিলেনিয়ামকে স্বাগত জানাবার অকল্পনীয় তৎপরতা থেকে বুঝা গেছে তাদের মধ্যে সহস্রাব্দ বিষয়ক আকিদা কতো গভীরভাবে বিদ্যমান। এই আক্বীদার ফলে ক্রুসেডের চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে ক্রুসেডীয় হামলার আদলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। ইসলামী দুনিয়ার উপর পাশ্চাত্যের ঝাঁপিয়ে পড়া এরই প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ। বিগত সহস্রাব্দে ক্রুসেড ঘটেছিলো বায়তুল-মোকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে। পাশ্চাত্যের পক্ষে আল-কুদস দখলে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে তারা আরেকটি সহস্রাব্দের জন্যে অপেক্ষা শুরু করে।

ইহুদীদের প্রতীক্ষিত সম্রাট ঃ সহস্রাব্দের বিশ্বাস এবং দুনিয়ার সাত যুগ বিষয়ক যে আকিদা ইহুদীদের মধ্যে রয়েছে, তা কোনো গোষ্ঠীমাত্রের আকিদা নয়। ইহুদী মাত্রই এ বিশ্বাস পোষণ করে। তারা মসীহের আগমনের জন্য ইসরাঈল রাষ্ট্রকে বুনিয়াদ মনে করে। সরকারীভাবেও এই বিশ্বাসকে লালন করা হয়। ইহুদীদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হলো শামাদান। হিব্রু ভাষায় যাকে আল মিনুরাত বলা হয়। এর সাতটি অংশ রয়েছে। যা দুনিয়া সৃষ্টির সাতদিনের ইশারাবাহী। এছাড়া এতে রয়েছে পৃথিবীর সাত সহস্রাব্দের ইঙ্গিত। অর্থাৎ প্রতিটি সহস্রাব্দে ইহুদীদের অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে। ইসরাঈলী সাম্রাজ্য হচ্ছে পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। সব সহস্রাব্দের রাজা হচ্ছে ইহুদীদের সহস্রাব্দ। সেটা হবে দুনিয়ার সবচে কল্যাণময় কালপর্ব। ইহুদীরা তাদের সহস্রাব্দকে নিশ্চিত করার জন্য সম্রাটের অপেক্ষায় আছে। সেই সম্রাটের আকিদা তাওরাতে রয়েছে— 'সাহয়ূনের পুত্ররা! আনন্দ করো। হে জেরুসালেম! শ্লোগান উচ্চারণ করো। দেখো তোমার সম্রাট তোমার দিকে আসছেন। সাহায্যকারী অনুগত গাধার উপর সওয়ার হয়ে।' (কিতাব জাকারিয়া ৯/১) ইহুদীরা এই বাদশাকে মাশী বলে থাকে। শব্দটি নির্গত হয়েছে হিব্রু মশহ শব্দমূল থেকে। মশহ অর্থ পবিত্র যয়তুন, যা গায়ে মাখা হয়। এই সম্রাট দুনিয়া জুড়ে ছড়ানো- ছিটানো ইহুদীদের সমবেত করবেন। আশরিয়া পুস্তকে উল্লেখিত হয়েছে— এই দিন সম্রাট স্বীয় হস্ত সম্প্রসারণ করে ইহুদীদেরকে আশুর, মিসর, ফা-তরুস, কুশ, ইবলাম, শোনার, হামাত এবং জাযাইরুল বাহরকে একত্রিত করবেন। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের হাতে পতাকা তুলে দেবেন। এবং নির্বাসিত ও দুনিয়ার নানা প্রান্তে অবস্থানরত ইহুদীদের একত্রিত করবেন (আশয়িা ১১/১) এজন্যে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন এলাকা থেকে ইহুদীরা যখন ফিলিস্তিনে জড়ো হচ্ছিলো, তখন ইহুদীদের একিন হয়ে গেলো যে অবশিষ্ট সকল ইহুদীকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে সমবেত করার জন্য মসীহের (আঃ) আগমন অনিবার্য। ইমানুয়েল হাইমান বলেন— অধিকাংশ অর্থোডক্স পন্ডিতের মতে

যেহেতু মসীহের (আঃ) আগমন নিকটবর্তী, তাই আমরা তাৎপর্যপূর্ণ একটি সময়ে অবস্থান করছি। পবিত্র ভূমিতে ইহুদীদের বড় একটা অংশের প্রত্যাবর্তন দ্বারা এ বিষয়টাই প্রমাণিত হচ্ছে।

জায়োনিস্ট ফান্ডালিজম গ্রন্থের লেখক সাক্ষাৎ করেন এক ইহুদী ধর্মযাজকের সাথে। প্রতীক্ষিত মসীহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে যাজক বলেন— আমরা নিশ্চিতভাবে ঈসা মসীহের (আঃ) নিকটবর্তী সময়ে অবস্থান করছি। তাওরাতে এ বিষয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। তাওরাতে ইস্তেনার ৩১ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে— তোমরা যদি অন্য সব সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে প্রভুর দিকে চলে আসো এবং যেভাবে হুকুম দেয়া হয়েছে, তা মানো, তাহলে প্রভু তোমাদের সকল বন্দিকে ফিরিয়ে দিবেন এবং তোমাদের উপর দয়া করবেন। গ্রন্থকার এর ভিত্তিতে লিখেন— 'তাওরাতের এই বক্তব্য শেষ যামানার সাথে সম্পৃক্ত। অচিরেই ইহুদীদের তওবা হয়ে যাবে।* সেই তওবা কোন তওবা? সেই তওবা হলো পবিত্র ভূমিতে প্রত্যাবর্তন। (উসুলিয়াতুল ইয়াহুদীয়্যা ১২ পৃ.) ইহুদী যাজক মুশে কুকম্যান বলেন— ইসরাঈলী সাম্রাজ্য আসলে সমাপ্তির ঘোষণা নয়। বরং নতুন যুগের প্রারম্ভিকা। বিপুল সংখ্যক ইহুদী যুবক ধর্মের দিকে এগিয়ে আসছে। এ সময়ে যে ইহুদী প্রজন্ম ধর্মের প্রভাবে জেগে উঠবে, তাওরাত-তালমুদের প্রতি তাদের আগ্রহ হবে প্রবল। তারা মসীহের প্রতীক্ষার দিনগুন্‌তে থাকবে।'

তালমুদের বক্তব্য— পবিত্র ভূমিকে হাতে আনার ব্যাপারে প্রত্যেক ইহুদীর চেষ্টা করা উচিত। ইহুদীদের মহাসম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। যাতে দুনিয়ার দুই তৃতীয়াংশ বসতি শেষ হয়ে যায় এবং মসীহের আহমন ও বিজয় অর্জিত হয়। (খলীফাতু আত-তাওরাতিয়া, ৮৯) অনুসারীদের প্রতি তাওরাতের জোর নির্দেশ হলো তারা যেনো মসীহের (আঃ) আগমন সম্পর্কে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে থাকে। আর হৃদয় দিয়ে যেনো তাকে ডাকতে থাকে। তিনি ডাক শুনবেন এবং আসবেন। (ফযহুত তালমুদ, যুহদী ফাতিহ) তালমুদ বলছে— প্রকৃত মসীহ আসবেন এবং বিজয় অর্জন করবেন। সেদিন মসীহ খ্রিস্টান ছাড়া সকলের হাদিয়া কবুল করবেন। (আত-তালমুদ, ওয়া তায়ালিমুহু–৬০) ঐ দিন ইহুদীদের কাছে সীমাহীন সম্পদ থাকবে। কারণ দুনিয়ার সব তাদেরই হবে।

তালমুদ— তাওরাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থঃ গল্প-কাহিনীতে ভরপুর। প্রতীক্ষিত মসীহের সবিস্তার বিবরণ তাতে আছে। ডক্টর বার্কলি তালমুদ পর্যালোচনা পূর্বক লিখেন— ঈসা মসীহ সম্পর্কে তালমুদে এমন সব কথাবার্তা পাওয়া যায়, যা অবিশ্বাস্য ঠেকে। যেমন মসীহের আগমনে ভূপৃষ্ঠের কান্না, মাটি থেকে কাপড়

বেরিয়ে আসা ইত্যাদি। তালমুদে লিখা আছে— ইসরাঈলের ভূমি কাঁদবে, জমি তৈরি করে দেবে উত্তম কাপড়, লেবাননের গম বড় হয়ে বৃহৎ খেজুর বৃক্ষের আকার ধারণ করবে। (পেন্দ্রেহা প্রটোকল ১৬৩ পৃ.) তালমুদের এই সব বক্তব্যে বিশ্বাস অতীতের কোনো বিষয় নয়, বরং তার প্রতি ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিশ্বাস আজ যেনো নতুন আঙ্গিকে পরিপুষ্ট হচ্ছে। ইহুদীদের প্রটোকলে বলা হয়েছে— গোটা ইউরোপ মিলে একটি মুকুট ইসরাঈলী সম্রাটকে হাদিয়া দেবে। তিনি যে দিন সেটা মাথায় দেবেন, সেদিন গোটা বিশ্বের ধর্মীয় নেতা সাব্যস্ত হবেন। সত্যিকার অর্থে তিনি হলেন দুনিয়ার (পাপ বিশ্বগীর্জার পরিচালক। আমাদের সম্রাট ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত আসমান জগতে তিনি মনোনীত। দুনিয়ায় এসে তিনি সমস্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ নিশ্চিহ্ন করবেন এবং ইসরাঈলী মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন (ইহজার আলা রিক্কাতিশ শতরঞ্জ, উইলিয়াম কার, ৪৪ পৃ.)

যায়োনিজমের প্রতিষ্ঠায় মসীহের আগমন তত্ত্ব ঃ যায়নবাদী প্রটোকল সম্পর্কে কারো সন্দেহ হলে জায়নিজমের ইতিহাসের দিকে তাকানো উচিত। সেখানে তিনি দেখতে পাবেন জায়নবাদের প্রকৃত চেহারা। এ আন্দোলনের অভ্যুদয়ের সাথে মসীহের আবির্ভাবের আকিদার সম্পর্ক গভীর। ১৭৭৩ সালে ইহুদীদের জাতিগত সমস্যাসমূহ নিয়ে নিয়মিত সম্মেলন শুরু হলে বিখ্যাত ইহুদী নেতা মেয়র রুটশেল্ড খুব গুরুত্ব সহকারে এতে অংশ নিতেন। তিনি প্রথম সম্মেলনে আয়োজকদের কাছে প্রস্তাব রাখলেন। যাতে তারা বিভিন্ন দেশে বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেন। এতে এই আন্দোলনগুলোর সহায়তা ইহুদীরা পাবে। এছাড়া বিভিন্ন দেশে নেতৃবৃন্দের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও জরুরী। তিনি এক লিখিত পরিকল্পনা পেশ করেন এবং বলেন— দুনিয়ার সম্রাট প্রতিশ্রুত মসীহ যখন আগমন করবেন, তখন যে সকল কর্মী আমরা আগ থেকে তৈরি করে রাখবো, তারাই তাঁর রাস্তা থেকে পাথর সরাবে।'

রুটশেল্ড এর পরে ইহুদী যাজক কলআ ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে খুবই উৎসাহী আহ্বায়ক। সহয়ূনী আন্দোলনের সূচনা তার হাতেই হয়। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত 'ইহুদীরা শুনো!' গ্রন্থে তিনি লিখেন— ইহুদীরা! ফিলিস্তিনে জড়ো হও! চতুর্দিক থেকে কুদসের দিকে ছুটো। কারণ প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের সময় এসে গেছে। তার চিন্তা-চেতনা থেকে প্রভাবিত থিউডর হার্জেল। তাকে জায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও রূপকার বলে মানা হয়। তিনি তার চিন্তাধারা ব্যক্ত করে বলেন— 'ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল কারণ প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন। তিনি আসবেন এজন্যেই ইহুদী রাষ্ট্রের প্রয়োজন।'

মৃত্যুর ৬ মাস আগে হার্জেল এক সাংবাদিক বন্ধুকে নিজের এক স্বপ্ন শুনাল। যা তিনি দেখেছিলেন বাল্যকালে। খুব আবেগময়ভাবে হার্জেল বলেন— আমার সামনে এক বুজুর্গের আকৃতিতে মসীহ আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি আমাকে দুহাতে তুলে নিলেন। তারপর বাতাসে উড়ে অনেক দূর নিয়ে গেলেন। এরপর মুসা (আঃ) এর আকৃতি আমার সম্মুখে ভেসে উঠলো। মসীহ (আঃ) মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বললেন— আমি এই শিশুর কল্যাণ কামনা করি। তারপর বললেন— যাও! ইহুদীদের বলে দাও, আমি দ্রুত আসছি। আমি আসবো বৃহৎ মু'জেজা নিয়ে। এবং অনুসারীদের জন্য মহান কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেবো।'

প্রতীক্ষিত মসীহের আকিদা যায়োনিজমের প্রতিষ্ঠাতাদের কাছ থেকে ইহুদী নেতৃবৃন্দ, ও তাদের কাছ থেকে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপকতা পেয়েছে। ইহুদীদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিন বলতেন— সাম্রাজ্য ফিরে পেতে হলে মসীহের আত্মপ্রকাশের বিশ্বাসকে ইহুদী ধর্মের মূল ভিত্তির মর্যাদা দিতে হবে। প্রত্যেক ইহুদী প্রতিদিনের উপাসনায় এ আকিদার কথাকে বারবার পুনরাবৃত্তি করবে। সে বলবে আমি মসীহের আগমনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমি তার অপেক্ষায় আছি।'

সেক্যুলার ইহুদী ও মসীহের আকিদা ঃ সেক্যুলার ইহুদী বেনগুরিনের আকিদার কথা আপনারা অবহিত হলেন। অন্য নেতাদের বিশ্বাসও অনুরূপ। অন্যতম সেক্যুলার নেতা স্টৌ মসীহের আকিদাকে সবকিছুর মৌলিক প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করেছেন। কুক হাফিন বলেন আমাদেরকে নিছক পবিত্র আত্মাবিশিষ্ট বলা ভুল। আমরা পবিত্র দেহেরও অধিকারী। এ কারণে আধ্যাত্মিক সংস্কার যেভাবে ইহুদীদের জন্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে দৈহিক সংস্কার ও স্বচ্ছতা। ইমানুয়েল বেঞ্জামিন বলেন— ইহুদী বন্ধুগণ! দুনিয়াকে পবিত্র মনে করো। এবং ইসরাঈলীদের জন্য সহস্রাব্দের অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টা করো। এতে সেক্যুলার লোকেরাও মানুষের ক্ষেত্রে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, কিংবা দৈহিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে অংশীদার হবে। কুদসের হিব্রু ইউনিভার্সিটির অর্থোডক্স ইহুদী দার্শনিক আয়ুরাহাম রাওনেকসি বলেন— '১৯৬৭ সালের আগে সেক্যুলাররা জায়নবাদের নেতৃত্বে ছিলো। তারাই ইসরাঈলী রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। সেনাবাহিনী ছিলো তাদের কর্তৃত্বে। আর অর্থোডক্সরা ছিলো তাওরাতের নিরাপত্তার বিধায়ক। গীরিয়া দেয়াল নিয়ন্ত্রণে আনার পর থেকে উগ্রপন্থীরা হয়ে গেলো জায়োনিজমের সর্বেসর্বা। তারা সবকিছু বাষ্পাকূল করে ফেললো ধর্মের ধূয়া তুলে।'

১৯৯৪ সালে এক ইহুদী ধর্ম নেতার মৃত্যু হয়। সে নিজেকে প্রতীক্ষিত মসীহ বলে দাবী করেছিলো। তার পিছনে জড়ো হয়েছিলো হাজার হাজার ইহুদী। তার সংক্ষিপ্ত কাহিনী হলো ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে উগ্রধর্মবাদী শ্লোগান নিয়ে হবর পার্টি অংশ নেয়। পার্লামেন্টে তাদের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তারপর তারা হাইকল– তাওরাত নামে নতুন এক দল গঠন করে। এ দল রাজনৈতিকভাবে মসীহের আগমনের সুসংবাদ প্রচার করে চললো। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে মসীহের (আঃ) নিকটবর্তী আগমনের নামে উত্তাপ ছড়াতে লাগলো। কর্মীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছাড়াতে লাগলো যে তারাই মসীহের বাহিনী। নেতারাও এই বক্তব্য দিতে লাগলো। তারা নিউইয়র্ক, লন্ডন, মাদ্রিদ, জেনেভা ইত্যাদিতে কালো কাপড় পরিধান করে নিজেদের আন্দোলন চালাতে লাগলো। ইহুদীদের পাড়ায় পাড়ায় এমনকি ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মের দাওঅত দিতে লাগলো। নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে বললো। মসীহকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হতে সাধারণ ইহুদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো। ফলে সৃষ্টি হয় উদ্দীপনা ও আবেগের প্রাণবন্যা এতে প্রভাবিত হয়ে ইহুদী ধর্মগুরু মোনায়েম সেজসন নিজেকেই প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবী করে বসলেন। তিনি তাওরাতের উপর খুবই পারদর্শী ছিলেন। বক্তৃতায়ও ছিলেন খুবই পারঙ্গম। তার বক্তব্য ছিলো অগ্নিবর্ষী। সময় ও পরিস্থিতির মর্মপাঠে তার দক্ষতা ছিলো অসাধারণ। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তার ডক্টররেট ডিগ্রি অর্জিত ছিলো। এই সব কারণে লোকদের কাছে তিনি জীবন্ত এক কিংবদিন্ত হয়ে উঠেন।

ইহুদীরা তার সম্পর্কে বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনীর জাল বুনতে থাকে। এবং তার বুর্ডক্লিনের বাসভবন অনুরাগী ইহুদীদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। নব্বইয়ের দশকে তার অনুসারীদের সংখ্যা বিপুল রূপ ধারণ করে। অনুসারীরা তাকে মসীহ বলে মান্য করতো। তিনি প্রথমে লোকদেরকে এ ব্যাপারে চুপ থাকার নির্দেশ দিতেন। পরবর্তীতে তা মেনে নিলেন এবং নিজেও দাবী করতে লাগলেন। তিনি বলতেন আমি হবর আন্দোলনের সপ্তম প্রজন্মের প্রতিনিধি। বংশের দিক থেকে দাউদ (আঃ) এর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু 'মুক্তিদাতা' এই ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। তার অনুসারীরা গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হলো। কেউ কেউ ভাবতে লাগলো তিনি সাদা পোশাকে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করবেন। তার এই ঘটনা বুঝিয়ে দিলো যে, মসীহের পুনরাগমনের বিশ্বাস ইহুদীদের মধ্যে কতো গভীরভাবে বিরাজমান। তারা প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে মসীহের আগমনের অপেক্ষা করছে।

এলাহিয়াতের ইহুদী ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল আসমার শোর্স রবিন হত্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন— 'রবিন হত্যার আসল কারণ অর্থোডক্স উগ্রতা নয়। জাতীয়তাবাদী আবেগও নয়। বরং এ হত্যা সংগঠিত হয়েছে মসীহের (আঃ) আগমনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। ছয় দিনের যুদ্ধের শ্লোগান উঠেছিলো যে পবিত্র ভূমিকে অপবিত্রদের হাতে রাখা যাবে না। এ ভূমি থাকবে ইহুদীদের হাতে। নতুবা মসীহের আগমন বিলম্বিত হবে।' ইমানুয়েল হাইম্যান লিখেন— ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো ইহুদী আকিদার হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা মসীহের আগমন সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন তুলার সুযোগই দেয় না। শেনইয়াহুর আমল ছিলো এই সব গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুসময়। তিনি পবিত্র ভূমি সম্পর্কে আগ্রহ পোষণকারী প্রত্যেকের প্রতিই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যায়োনিস্ট ফান্ডামেন্টালিজম এর লেখকের মতে– ডানপন্থীরা সফল হওয়ায় নতুন ইহুদী বসতি সম্পর্কে সমঝোতার সম্ভাবনা দূর হয়ে গেছে। তাদের মতে 'তাওরাতভূমিতে' মসীহের আগমনের পূর্বে ইহুদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা জরুরী। প্রতীক্ষিত মুক্তির মুহূর্তটি সন্নিকটে। অতএব এ ভূমির ক্ষেত্রে অপেক্ষার কোনো সুযোগ নেই।

এতে বুঝা যাচ্ছে এহুদ বারাক নির্বাচিত হয়ে ইহুদীবাদী দলগুলোকে খুশি করতে গিয়ে বসতি নির্মাণ প্রকল্প অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেবে। পূর্ব জেরুসালেমের ব্যাপারে ও চলমান নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। এবং কোনোভাবেই ১৯৩৭ সালের পূর্বের সীমানায় ফিরা হবে না। উগ্র ইহুদীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এতো বেশি যে, ইসরাইলে যিনিই প্রধানমন্ত্রী হন, সর্বাগ্রে তিনি এদের খুশি করতে তৎপর হয়ে উঠেন। উগ্রবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রকট মতানৈক্য থাকলেও প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) ব্যাপারে সবাই এক মত পোষণ করে।

গোপন সংগঠন, গোপন প্রস্তুতি ঃ মসীহের আগমন যেহেতু ইহুদীদের কেন্দ্রীয় ইস্যু, তাই একে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রে নিজেদের প্রভাবের জাল বিস্তার করছে ইহুদীরা। যাতে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কেউ প্রতিবন্ধক না হয়। শুধু তাই নয়, তাদের দৃষ্টি আরোও অনেক দূরে। উইলিয়াম কার লিখেন— ইহুদীরা ফিলিস্তিনে নিজেদের কর্তৃত্ব বাস্তবায়নে ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। তারা চায় চূড়ান্তভাবে গোটা বিশ্বে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। যাতে নিজেদের সম্রাটকে দুনিয়ার রাজাধিরাজ বানাতে পারে। ইমানুয়েল হাইম্যান বলেন— একুশ শতকে ইহুদীদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো অতীতের সাথে গভীতর সম্পর্ক তৈরি করা। যাতে করে নতুন এক ভবিষ্যতের জন্য তারা তৈরি হতে পারে। অপরদিকে খ্রিস্টানরাও নতুনভাবে বিশ্বপুনর্গঠন করতে

চায়। যাতে ঈসা মসীহের (আঃ) অধীনে খ্রিস্টীয় এক সহস্রাব্দ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেন মসীহ? কোন মসীহ ?

হযরত ঈসা মসীহের (আঃ) ব্যক্তিত্ব নিয়ে দুনিয়া জুড়ে যে পরিমাণ বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ রয়েছে, গোটা মানবেতিহাসে আর কারো ব্যক্তিত্ব নিয়ে এর অর্ধেক বিতর্ক হয়নি। এই বিতর্ক বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। একে কেন্দ্র করে উদঘাটিত হয়েছে আলোচনা-পর্যালোচনার এমন বিপরীতমুখী ধারা, যা সাম্প্রতিক পৃথিবীতে নতুন মাত্রার ব্যাপকতা পেয়েছে। আজকের পৃথিবীতে হযরত ঈসা মসীহের (আঃ) প্রসঙ্গ খুবই উত্তপ্ত আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব নিয়ে চলছে জাতিতে জাতিতে বহুমুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

চরমপন্থী খ্রিস্টানরা বলে বেড়াচ্ছে সময় এসেছে, এবার পৃথিবীতে ঈসা মসীহ (আঃ) নেমে আসবেন। তারা ঈসা (আঃ)-এর প্রত্যাবর্তন বিষয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করছে, তা নয়, বরং ঈসা (আঃ) কে স্বাগত জানাবার ব্যবস্থাপনায়ও লেগে গেছে। কত দ্রুত তিনি নেমে আসেন, তারা এর অপেক্ষা করছে। তাদের মতে ঈসা মসীহের জন্মের দুই হাজার বছর পেরিয়ে যাবার পর তার পুনরাগমন ঘটবে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ইহুদী। এরা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অস্বীকৃতিবাদী। তবে নিজেদের কল্পিত এক মসীহের (আঃ) আগমনের অপেক্ষা করছে। তারাও বলে চলছে মসীহ (আঃ) খুব দ্রুত আসবেন।

মুসলমানরা ঈসা মসীহ (আঃ) সম্পর্কে বিশ্বাস করেন যে তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কিয়ামতের আগে তিনি অবতরণ করবেন। এবং ইসলামী খেলাফতকে পুনরোজ্জীবিত করবেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান দ্বীন থেকে দূরে থাকা এবং তাদের অজ্ঞতা ও গাফলতির কারণে আশংকা হয়, ইহুদী খ্রিস্টান নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যখন তুমুল আকারে ঈসা মসীহের (আঃ) আগমন বিষয়ে মিথ্যা প্রচার চালাবে, তখন বহু সংখ্যক মুসলমান বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় জটিল ফিতনা দেখা দেবে।

এ কারণে মনে হচ্ছে ঈসা মসীহ (আঃ)-এর সঠিক পরিচয় পেশ ও তার বিষয়ে উম্মতকে অবগতকরণ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন জরুরী।

খ্রিস্টানদের প্রতীক্ষিত মসীহ (আঃ) ঃ ইহুদীরা নিজেদের মসীহের অপেক্ষা করছে তাওরাতের কাল থেকেই। আর খ্রিস্টানরা প্রতীক্ষা শুরু করে ইঞ্জিলের সময়

থেকে। কিউর আন্ট তার বিখ্যাত গ্রন্থ স্টোরি অব কালচারে লিখেন — এক সম্মিলিত আকিদা খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। সেই আকিদা হলো ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। এবং ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের জন্য দ্বিতীয়বার তিনি আসবেন। তার উপর বিশ্বাস পোষণকারী পরকালে স্থায়ী কল্যাণ অর্জন করবে। খ্রিস্টানরা এটাকে শুধু বিশ্বাসও বক্তব্যের মধ্য সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং তারা এ আকিদার প্রচারে পুরো সচেষ্ট। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক অর্থোডক্স-প্রোটেস্টান্ট প্রত্যেকেই ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে বিশ্বাস রাখে। বিশেষত তৃতীয় সহস্রাব্দে তার আগমনকে স্বাগত জানাবার জন্য এক শো বছর ধরে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রোটেস্টানদের উৎসাহ এক্ষেত্রে সবার উপরে। প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয় মার্টিন লুথারের হাত দিয়ে। তিনি ইঞ্জিলের পাশাপাশি তাওরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণের দাওয়াত দেন। তাওরাতে যেহেতু শেষ জামানায় এক উদ্ধারকারীর কথা জোর দিয়ে বলা আছে, তাই লুথারের অনুসারীরা তাকে ঈসা মসীহ বলে স্থির করে নিলো। বিশেষ করে ঈসা (আঃ) এর মায়ের বংশসূত্র দাউদ (আঃ) এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বলে জোর প্রচারণা চালানো হয়। এ কারণেই ইহুদীদের সাথে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে আছে দুনিয়ার শেষ দিকে এক মসীহ আসবেন। তাঁর রাজত্বের কেন্দ্রস্থল হবে কুদস শহর। তিনি হাইকলে সোলেমানী আবাদ করবেন।

এ বিষয়ক আকিদা সমূহের সংরক্ষণে প্রোটেস্টান্টরা খুবই সচেতন। যেহেতু এই আকিদাগুলোর সত্যায়ন বাইবেলে রয়েছে, তাই এর উপর প্রশ্ন তোলার সুযোগই কাউকে তারা দিতে প্রস্তুত নয়। ইঞ্জিল বলেছে ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের কথা। তাওরাত বলছে একই কথা। তবে ইহুদীরা মনে করে তাওরাতে বর্ণিতপয়গাম্বর খ্রিস্টানদের মসীহ নন, তিনি ভিন্ন একজন। ভিন্ন ও নতুন এক সত্তা। প্রোটেস্টান্টদের এ বিশ্বাসও শক্ত যে ঈসা মসীহ (আঃ) তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতেই আসবেন। এবং যে সকল ইহুদী কুদসে অবস্থান করছে, তারা ঈমান আনবে মসীহ নবীর প্রতি।

আমেরিকান লেখক লুই উব্রিন লিখেন— অধিকাংশ প্রোটেস্টান্ট এ বিষয়ে একমত যে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পবিত্র গ্রন্থের প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়ন। জেরুসালেমে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এই জানান দিচ্ছে যে ঈসা মসীয়ের আগমন অত্যাসন্ন। (ইসরাঈলের সহায়তায় আমেরিকায় ইহুদী তৎপরতা, লুই উব্রিন, ২৮৬) ১৯৫৪ সালে ত্রয়োনাল্টনে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টান গীর্জাগুলোর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ইহুদী বিষয়ক এক প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এতে লিখা হয়— ঈসা মসীহের

দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্পর্কিত খ্রিস্টীয় ধারণা থেকে ইহুদীদের বিচ্ছিন্ন ভাবা উচিত নয়। ওল্ড টেস্টামেন্টের গভীর অধ্যয়নে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সাহায্য সর্বদাই ইহুদীদের সঙ্গি হবে। অতএব এদের থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতার কোনো অর্থই হয় না। আমরা তাদেরকে সঙ্গী রাখবো এবং যিশু খ্রিস্টের হাতে তাদের বায়আত গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমাদের কোনোইশান্তি নেই। কনফারেন্সে পাদ্রি ও বিশপদদের বিভিন্ন বক্তব্যে বলা হয়— আমরা বিশ্বাস করি, মানবজাতির মুক্তির জন্য ইসরাঈলকে খোদাপাক বাছাই করেছেন। আর আমরা হচ্ছি প্রাচীন বৃক্ষ ইসরাঈলের ডালপালা। নতুন প্রজন্মের ইহুদীরা খোদা কর্তৃক নির্বাচিত প্রাচীন ইহুদীদের প্রতিনিধি। মসীহের দ্বিতীয় আগমনের জন্য আমাদের প্রতীক্ষার মূল কারণ হলো আমরা চাই ইহুদীরা তাঁর আগমনে খ্রিস্টান হয়ে যাক। যা প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচিত সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ।

কী আছে এই ভালোবাসার অন্তরালে ?

ইহুদীদের প্রতি খ্রিস্টানরা ভালোবাসার যে জজবা দেখাচ্ছে, তা এককথায় বিস্ময়কর। যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন— এই মব্বতের অন্তরালে কী আছে? কেন এতো প্রীতির উচ্ছ্বাস? আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ ও সংক্ষিপ্ত। কারণ ইহুদীদের প্রতি খ্রিস্টানদের এই অস্বাবাবিক ঝুঁকে পড়ার পিছনে রয়েছে কিছুটা বিভ্রান্তি আর কিছুটা গোপন অভিসন্ধি। পশ্চিমা খ্রিস্টানরা তো নিজেদের ফায়দা ছাড়া কোথাও দৃষ্টিপাত করতেও রাজি নয়। ইহুদীদের প্রতি স্নেহের নজরে তারা কখনো তাকায়নি। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট বিপ্লব তাদের মধ্যে এই ভাবধারা তৈরি করলো যে, খ্রিস্টানদের বিশ্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে হলে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা জরুরী। ইহুদীরা যখন কুদস শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, হাইকলে সোলেমানী নির্মাণ করবে, তারপরই নিশ্চিত হবে ঈসা মসীহের (আঃ) আগমন। ঈসা মসীহের আগমনের পথ রচনা করবে ইহুদীরা।

কিন্তু তিনি এসে প্রথমেই হত্যা করবেন ইহুদীদের মসীহকে। হত্যা করবেন দুই তৃতীয়াংশ ইহুদীকে। অবশিষ্ট ইহুদীদের খ্রিস্টান বানাবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছেঃ

মরিয়ম (আঃ) পুত্র মসীহ নবীর আগমনের পূর্বে আরেক মসীহ আসবেন বলে খ্রিস্টানদের একীন রয়েছে। হ্যাঁ, খ্রিস্টানরা সেই বিশ্বাস পোষণ করে। প্রথম মসীহকে তারা মনে করে দাজ্জাল— এন্টি ক্রাইস্ট।

মসীহ্ ও এন্টিক্রাইস্ট ঃ প্রোটেস্টান্টদের আকিদা মতে– ধর্মহীন, নিপীড়ক, ও মানবতার শত্রু এক পাপাত্মা ঈসা মসীহের (আঃ) দ্বিতীয়বার আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে নেমে আসবে। সে হবে ইহুদী বংশোদ্ভূত। সে ইসরাঈলের উত্তরাঞ্চল, বিশেষত সিরিয়ার ডান গোত্রভূক্ত ইহুদী কবিলায় জন্ম গ্রহণ করবে। তার বাহিনীতে ছেয়ে যাবে গোটা বিশ্ব। সে সততা ও বুজুর্গীর ভান করবে এবং মুক্তিদাতা মসীহের (আঃ) আকৃতির অনুকরণে* সচেষ্ট হবে। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই যে প্রভূত্বের দাবী করবে। সে বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটাবে, ফলে লোকেরা তার প্রভুত্বে বিশ্বাসীদেরকে কঠিন শাস্তি ও দূরবস্থায় সে নিক্ষেপ করবে। তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। এরপরে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ধাবিত হবে। এবং মসীহ ইবনে মরইয়ম অবতরণ করবেন। ঈমানদারদের তিনি হেফাজত করবেন, মসীহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। ধ্বংস করবেন তার সব ইহুদী অনুসারী ও ইয়াজুজ মাজুজ (গগ মেগগ)দের। এরপর প্রতিষ্ঠিত হবে প্রভুর সাম্রাজ্য। সূচনা হবে সহস্রাব্দ ব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তার।'

এই দাজ্জাল সম্পর্কে খ্রিস্টানদের আকিদার যে বর্ণনা তাদের ধর্মগ্রন্থে রয়েছে, তাতে আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও তা'লীমের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন সমস্ত নবী রাসূল (সাঃ) নিজেদের উম্মতকে দাজ্জালের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। নবীয়ে করীম (সাঃ) এও বলেছেন যে আদম (আঃ) থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে না। তিনি বলেছেন– আমি সর্বশেষ নবী, তোমরা সর্বশেষ উম্মত। দাজ্জাল তোমাদের মধ্যে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। (ইবনে মাজা, আবু দাউদ, হাকিম) হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন— দাজ্জাল হবে ইহুদী। তার মা হবে ইহুদী, সে প্রকাশিত হবে ইহুদিয়্যা এলাকায়। তার অধিকাংশ অনুসারীই হবে ইহুদী। সে মক্কা, মদীনা ও কুদস এলাকা ছাড়া গোটা বিশ্বকে অধিনস্ত করবে। তার হাতে প্রকাশিত হবে বিস্ময়কর ঘটনাবলী। মানবেতিহাসে তার ফিতনাই হবে সবচে বড়। (মুসলিম)

দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বিদ্যমান হাদীসের বর্ণনার অনুরূপ। অর্থাৎ দাজ্জাল প্রকাশ পাবে, সে হবে ইহুদী, তার অনুসরণ করবে ইহুদীরা, তারা ছেয়ে যাবে গোটা বিশ্বে, তারপর ঈসা মসীহ (আঃ) আসবেন, তার হাতে বিশ্বের মুক্তি নিশ্চিত হবে। সুতরাং ইহুদীদের সাথে খ্রিস্টানদের বন্ধুত্ব আসলে রহস্যাবৃত। উগ্র খ্রিস্টানরা ইহুদীদের গীনিপিগ বানাতে চায়। ল্যাবরেটরীতে যত্ন করে ইদুর ব্যাঙ ও অন্যান্য প্রাণী রাখা হয় বিশেষ উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহারের জন্য। কাজ ফুরালেই ফেলে দেয়া হয়। ইহুদীরা আসলে গীনিপিগ হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ যাদেরকে দাজ্জালের অনুসারী বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। দাজ্জালের বিশ্বাস খ্রিস্টানদের একটি অনিবার্য বিষয়। এ এক অকাট্য নীতি, যে বিশ্বাসকে তারা পরিহার করতে পারবে না। স্টালোস্কির অধিবাসীদের নামে লিখিত সেন্টপলের পত্রে উল্লেখ আছে— কেউ যেনো তোমাদের ধোকায় ফেলতে না পারে। প্রথমেই দেখা দেবে ধর্মত্যাগের ফিতনা।' এখানে ধর্মত্যাগ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আসলে ধর্মত্যাগের বিষয়টি নিয়ে খ্রিস্টানরা খুবই পানি ঘোলা করেছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরকে ধর্মত্যাগী বলে অভিহিত করার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এমনকি তারা একে অপরকে এন্টি ক্রাইস্ট পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছে। প্রাচ্যের আরব বংশীয় অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা পাশ্চাত্যের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদেরকে খ্রিস্টান বলেই মানে না। কারণ ওরা দাজ্জালের সহযোগী হবে। সফরে দানিয়ালের ব্যাখ্যায় পাদ্রি নাশিদ হান্না লিখেন— ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান হবে মসীহের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সমস্ত মুরতাদ হবে একই গোষ্ঠীভূক্ত। অপরদিকে গীর্জার পোপরা অর্জন করবেন তাদের হারানো প্রভাব প্রতিপত্তি। সমস্ত গীর্জা মিলে এক মহাঐক্যের পাটাতন গড়ে উঠবে। তারা হবেন মসীহের বাহিনীর সেবক। তারা হবেন অগ্রগামী।

সফরে রুইয়্যার ব্যাখ্যায় তিনি লিখেন— 'দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ এই অধঃপতন ও বিপর্যয়কে আজ প্রত্যক্ষ করছে। ধর্মত্যাগী খ্রিস্টানদের উন্নতি মানুষের চোখকে ধাধিয়ে দিচ্ছে। এ উন্নতি এমন পর্যায়ে পৌছবে, যে মানুষ এতে বিভ্রান্ত হয়ে শয়তানের উপাসনা শুরু করবে।' ফাদার সার্কেস তার 'ইহুদী খ্রিস্টান সম্পর্ক' গ্রন্থে লিখেন— ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান আর ইসরাঈলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সেদিন খুবই নিকটবর্তী, সেদিন মহাপ্রভু এইসব খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। 'দানিয়ালের ভ্রমণ' এর ব্যাখ্যায় ইরন স্যেইট লিখেন— ইউরোপের দশ বৃহৎ শক্তি এক কোয়ালিশন বানাবে। এরা কাজ করবে একই রাষ্ট্র শক্তির মতো। তাদের নেতা হবে বর্বর দাজ্জাল। পাদ্রী সয়েগ "চয়েজ অব নেশন্স' গ্রন্থে লিখেন— ধর্মত্যাগী গীর্জা বর্বর এন্টিক্রাইস্টকে নিজের ও ইহুদীদের উপর পুরো কর্তৃত্বের অধিকারী মানবে। তারা সম্মিলিতভাবে ইহুদীদের সাম্রাজ্য হেফাজত করবে। মসীহ দাজ্জাল হবে এই দুই সম্প্রদায়ের একনায়ক। ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বিশ্বনেতা।'

ড. আব্দুল আজিজ মোস্তফা কামিল

তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত

তরজমা: মুসা আল-হাফিজ

প্রকাশক ঃ
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৯২৩৫

প্রথম প্রকাশ ঃ
রবিউস-সানী–১৪৩২ হিজরী
মার্চ–২০১১ ইংরেজী
ফাল্গুন– ১৪১৭ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 978-9848-675-15-1

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শাখা. ৫৫/ বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ISBN 978 984 8675 15-1